ঈদে মিলাদুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সংকলন

আলোকধারা বুক্স

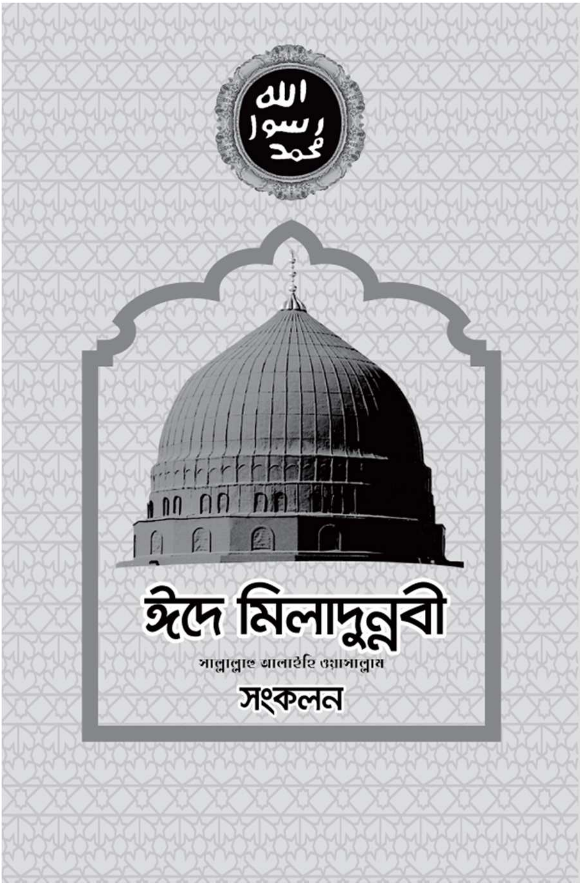

আলোকধারা বুকস্

এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশন

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকলন
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রিত মাইজভাণ্ডারী একাডেমি'র প্রকাশনা শাখা 'আলোকধারা বুক্স'।

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক- ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশ
৩০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী

মুদ্রণঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম- ৪২১২।

ISBN: 978-984-8083-21-5

মূল্যঃ টাকা ১৫০

ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপিত হোক মহাসমারোহে সকলের সম্মিলিত উদ্‌যোগে

মহানবী (দ.) বিশ্বের সকল মানুষ এবং সৃষ্টির জন্যে অশেষ রহমত। ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) তাই সবারই একই লক্ষ্য ও আনন্দের উৎস। এদিনটি তাই সকল মানুষ বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহ একই সাথে একযোগে পালন করতে পারে। কেউ 'মিলাদুন্নবী (দ.)', কেউ 'সিরাতুন্নবী (দ.)', কেউবা 'উরসুন্নবী (দ.)' উপলক্ষে নানা ত্বরিকা, আক্বিদা ও মাজহাবের আলোকে দিনটি স্ব স্ব আঙ্গিনায় উদ্‌যাপন করেন। কিন্তু মহানবী (দ.) এর প্রতি সবার সম্মান, দরুদ ও সালামের অনুভূতি একই। সেই সাথে সবাই মহান আল্লাহ্‌র দরবারে একইভাবে শোকর গোজারি করেন। তাই এই পবিত্র দিনটিতে পথ, মত, ত্বরিকা, আক্বিদা নির্বিশেষে সবাই এক সামিয়ানার ছায়ায় এক কাতারে এসে বলতে পারেন, 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা'। ঐক্যের অনূভূতিতে পরস্পর কাছে আসার, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে হাতে হাত রাখার আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা'। ঐক্যের অনুভূতিতে পরস্পর কাছে আসার, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে হাতে হাত রাখার এমন অসীম রহমতপূর্ণ উপলক্ষকে তো নবীপ্রেমিকরা কাজে লাগাতে পারেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে এই মহান দিনটি উদযাপনের তৌফিক দান করুন। আমিন।

সূচী পৃষ্ঠা

ভূমিকা : খুদে কলমে খুদে চিন্তা ৭

মদীনা সনদ এবং বহুত্ববাদী সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা
মোঃ মাহবুব উল আলম ১০

একনজরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন
অধ্যাপক জহুর উল আলম ১৮

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ ৩১

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি এবং তাঁর তাসাওউফ জীবনের পুণ্যছায়ায় সাহাবিগণ
ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ ৪৭

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাওলানা হাফেজ আবুল কালাম ৫৮

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব তাৎপর্য
এস এম এম সেলিম উল্লাহ্ ৭৬

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.) ও আহমদ মুজতবা (দ.) মোবারক নামদ্বয়ের তাৎপর্য এবং সংস্কারসমূহ
আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী ৯৩

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন
ইবনে আবদুশ শাকুর ১০৫

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের তাৎপর্য
জাবেদ বিন আলম ১০৯

পবিত্র কুরআনের আয়নায় ঈদে মিলাদুন্নবী এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ১১৩

একনজরেঃ দেশে দেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন ১১৭

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র

অন্যতম খলিফা মুফ্‌তি-এ-আযম মাওলানা

সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.) রচিত

না'ত-ই রাসূল (দ.)

ای شاہِ عالَم مبتلا در عشقِ تو حور و پری | جن و بشر شیدائی تو بر جملہ عالَم سروری

وصفت چہ آید در رقم کان نگنجد در قلم | ہر آنچہ در شانِ تو میگویم از آں بالاتری

چیزی نیابم در جہاں تا گویم اَنْتَ مِثْلُہٗ | شمس و قمر گویم ترا از آں روشن تری

حسن ترا جلوہ عجب کز عکس آں اہلِ جہاں | مفتون تو یکسر شدند ای ماہ برج دلبری

اندر جہاں گر دیدہ ام بسیارِ خوباں دیدہ ام | ہرگز ندیدم مثلِ تو خوبی بایں خوش منظری

تا تو بوصفِ شاہدی در محفلِ جاناں شدی | خوباں عالم را ز ہش بردی بایں جلوہ گری

شیدا امین بے نوا از جاں و دل بر تو فدا ،

دارد بدرگاہت رجا کو نصفِ سویش بنگری ،

ভূমিকা

খুদে কলমের খুদে চিন্তা

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের আদিম অনুষ্ঠান। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে তা আজ অবধি চলমান। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আপন সত্ত্বাতে অনাদিকাল গুপ্ত থাকার পর স্বীয় সিফাত ও জাতকে প্রকাশ করার জন্য, সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনার কুদরতি অভিপ্রায় থেকে মিলাদের আদি সূচনা। তিনি জাতে কাদীম থেকে "আহাদিয়্যাত" এর মধ্যে নিজকে আনলেন। "আহাদিয়্যাত" বা একত্বের এ অবস্থান থেকে "নুজুল" বা নিম্নাবতরণের মাধ্যমে "ওয়াহেদিয়াত" একের অবস্থানে অবতরণ করলেন। অতপর এ "ওয়াহেদিয়াত" বা একের অবস্থানের স্বীয় নূর থেকে এক মুষ্টি নূর নিয়ে নূরে মুহাম্মদী (দ.) বা হাকীকতে মুহাম্মদী (দ.) সৃষ্টি করলেন। প্রিয় নবীজী (দ.) এর হাদিসে কুদসী মর্মে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "আমি গোপন খণিতে গুপ্ত ছিলাম, আমি নিজকে প্রকাশ করতে চাইলাম, তাই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনলাম" হাদিসে কুদসী–

"আলমে হাহুত" বা স্থান কাল অবমুক্ত জগতে মহান আল্লাহ্ তায়ালা প্রিয়–মাহবুব নবী (দ.) এর সৃষ্টির বাহানায়, স্বীয় সত্ত্বায়–তানাজ্জুল বা নিম্নাবতরণের ধারাবাহিকতায়, সৃষ্টির আদি রহস্য মিলাদুন্নবী (দ.)-এর অবতারনা করেন।

এরপর "আলমে আরোয়াহ" বা রূহ্জগতে সে আদিনেপথ্যে নূরে মুহাম্মদী (দ.) নিয়ে আলোচনা হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের ৮০নং আয়াতে বিবৃত হয়, "আর আল্লাহ্ তায়ালা যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দিয়েছি, কিতাব ও জ্ঞান। তারপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আগমন করেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে সাক্ষী দেয়ার জন্য। তখন তোমরা সে রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কী অঙ্গীকার করেছো এবং এই শর্তে আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছো কী? তারা বললো, আমরা অঙ্গীকার করেছি।"

মূলতঃ আলমে আরোয়াহ বা রূহ্ জগত হতে এটি নূরে মুহাম্মদী (দ.) এর স্বীকৃতি মর্মে আম্বিয়া (আ.)দের নিয়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালার "মিলাদ" অনুষ্ঠানে প্রিয় নবীজী (দ.) সম্পর্কিত পর্যালোচনা। এরপর "আলমে মালাকুত" বা ফেরেশ্তা জগতে আসলো নবীজী (দ.)'র সম্মান ও পরিচিতির পালা। এতে নবীজী (দ.)'র হাকিকতকে তাজিম ও ইজ্জত এর ভিত্তি দিয়ে নির্ণয় হলো কে মলকী বা ফেরেশ্তা সমেত সত্ত্বা, আর কে তাগুতী বা পাপিষ্ঠ সীমা লংঘনকারী। নূরে মুহাম্মদী (দ.) কে আদি পিতা হযরত বাবা আদম সফীউল্লাহ্ (আ.) এর কপালে প্রতিস্থাপনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলেন। এরপর আদেশ হলো, তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে অভিবাদনমূলক "সিজদায়ে তাজিমী"র হাদিয়া পেশ করতে। তাজিম হাকিকতে মুহাম্মদী (দ.) এর কারণে বাধ সাধল শয়তান। কোরআন বলে, "এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য পাপিষ্ঠদের শত্রু সৃষ্টি করেছি।"

হাকিকতে মুহাম্মদী (দ.) এর বিরুদ্ধাচরণ পাপিষ্ঠের ভাগ্য বরণ করতে হয়। এমন রীতিতে আল্লাহ্ তায়ালা আলমে মালাকুতে সে বিরুদ্ধাচরণকারী মালাউন ইবলিসের সঠিক পরিচয় জানিয়ে দেন।

অতঃপর যুগে যুগে ইনসানে কামেল আম্বিয়া (আ.) গণের বংশ পরম্পরায় প্রিয় নবীজী (দ.) এর নূর মহান রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে শুভাগমন করেন। এক শুভক্ষণে খাজা আবদুল্লাহ্ ও আম্মা আমিনা খাতুন (রা.)-এর মাধ্যমে নবীজী (দ.) আলমে নাসুত বা অস্তিত্ব জগতে তাশরিফ আনলেন।

আলমে নাসুত বা দৃশ্যমান জগতের পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যতায় নবীজী (দ.)-এর "মিলাদ" বা শুভাগমন বহুমাত্রিক তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহলোক নিয়ে মূলত পারলৌকিক ফলাফল হয়। তাই নবীজী (দ.)-এর হাদিস শরিফে এসেছে "ইহজগত পরকালের শষ্যক্ষেত্র"। পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গীতে ১২ রবিউল আওয়াল একই সাথে মহানবী (দ.)-এর জন্ম ও বেসালের দিন। পার্থিব নিয়মানুসারে যে কোন মানুষের প্রস্থান তাঁর পরিবার সমাজ ও দেশের জন্য বিশাল শূন্যতা সৃষ্টিকারী। কিন্তু নবীজী (দ.) এর পর্দা গ্রহণ মানব সমাজ ও সভ্যতার কোন পর্যায়ে তিনি শূন্যতা রেখে যাননি। যদিও তাঁর বেসালের চেয়ে তাঁর উম্মতের জন্য অধিক বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারেনা। তিনি প্রেরিত হন 'রহমত' স্বরূপ। ইরশাদ হয়েছে "আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতসমূহের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)।

অপর আয়াতে এসেছে "আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামতরাজিকে পূর্ণতা দিলাম, আর ইসলামকে তোমাদের এক মাত্র জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম (মায়িদা : ৩)। রবিউল আওয়াল মাসের মিলাদ অনুষ্ঠানের আমেজ সুন্নী-সমাজে লক্ষ্যণীয় পর্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। এ অনুষ্ঠানের যে দুটি দিক আমরা দেখি তা হলো, রাসূল (দ.) যে আদর্শের ঘোষণা দিয়ে একটি বর্বর জাতিকে আদর্শ জাতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফুটতে থাকা একটি সমাজকে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে এনে দিয়েছিলেন; সেই মহান আদর্শে উত্তরণের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি। আদর্শকে আনুষ্ঠানিকতাতে সীমাবদ্ধ না করে, তা বাস্তব প্রয়োগের নির্দেশনা এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে, হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর–আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু (সূরা মায়িদা : ৩১)।

প্রিয় নবীজী (দ.) চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমেই একটি জাতি গঠন করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজী (দ.) বলেছেন, নিশ্চয় আমি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি (ইবনে মাজাহ্)। তাঁর আদর্শ ধারণের কারণে তাঁর সাহাবা কেরামগণ যুগের সর্বোত্তম মানুষ হতে পেরেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ

(রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, নবী (দ.) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (সহিহুল বুখারী)।

প্রিয় নবীজী (দ.) আইয়্যামে জাহিলিয়াত নামক ঐতিহাসিক তৎকালীন পাপাচার, কুসংস্কার, মিথ্যাচার থেকে পরিত্রাণ দাতা। তিনি মানবতার তিনটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেন। অধিকার ও সুবিধা বঞ্চিত অবহেলিত মানবতার মুক্তিদাতা, মর্যাদাহীন নারী জাতির পারিবারিক সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করণসহ নারীর প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ধর্মীয় ভাবধারায় পৌত্তলিকতাসহ সকল অন্যায্য বিষয় দূরীকরণের মাধ্যমে তাওহীদ ভিত্তিক কলেমার ও নবুয়তের বাহক, রাষ্ট্র ও জাতির প্রতিষ্ঠাতা, সেনানায়ক, বিজ্ঞ বিচারক, সমাজ সংস্কারক ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক ও প্রাজ্ঞ শাসনকতা হিসেবে গৌরবদীপ্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেন। মদিনার শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে বহু জাতির সন্ধির মাধ্যমে সকল ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করেন। যুগ যুগান্তরে জাতিগত ও বর্ণ বৈষম্য, বংশগত প্রাধান্যের বিলোপ সাধন করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। রক্তের পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের বৃহত্তর ইসলামী রাষ্ট্রের তিনি রূপকার। দাসত্বের শিকল মুক্ত করে মানবতাকে মুক্ত গগনে অবমুক্ত করা হয়। একতা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, সাহস, ত্যাগ, একাগ্রতা, সাধুতা, ইবাদত, ভদ্রতা, সেবা, সরলতা ও প্রেমের আদর্শের দৃষ্টান্ত তাঁর জাগতিক মুয়ামিলাত থেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

প্রিয় নবীজী (দ.) এর শুভাগমনের মিলাদুন্নবী (দ.) অনুষ্ঠান, তাঁর উম্মতের জন্য একটি ইবাদত। দলিল প্রমাণ উক্তির নিরিখে এ গ্রন্থে বিজ্ঞ লেখকদের কলমে তা সুস্পষ্ট। ধর্মের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও তা নিঃসন্দেহে ফজিলতপূর্ণ। তাই পূর্বে উল্লেখ করেছি, সৃষ্টির আদি থেকে দৃশ্যমান জগতের অবস্থান পর্যন্ত নবীজী (দ.) এর মিলাদুন্নবী (দ.) এর রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। যে কারণে নবীজী (দ.) এর জাহেরী তাৎপর্যকে অনুধাবণ পূর্বক অনুসরণ হলো ইবাদত। যা হবে পারলৌকিক মুক্তির কারণ। নবীজী (দ.) এর মিলাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনকে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা মিলাদুন্নবী (দ.) এর দাবি। তার ইত্তেবা এর মাধ্যমে ইহলৌকিক জীবন গঠন হওয়া চাই। মূলত গ্রন্থের মূল বিষয়টি ভূমিকায় আলোচনা করে ফোকাস করা হয়। নবীজী (দ.) এর জীবনের প্রতিটি দিকই গ্রন্থ নয় বরং একেকটি গ্রন্থাগার। গবেষকদের জ্ঞানের গভীরতা তাঁদের কলমে প্রতিফলন হয়। আশা রাখি এ গ্রন্থটি নবীজী (দ.) মিলাদের সবদিক সমূহ ছুঁয়ে গেছে। যা পাঠক মহল ও চিন্তাশীলদের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

মাওলানা সৈয়দ আবুল ফজল মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ সুলতানপুরী
নায়েবে-সাজ্জাদানশীন
সাতগাছিয়া দরবার শরীফ, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মদীনা সনদ এবং বহুত্ববাদী সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা

মোঃ মাহবুব উল আলম

১. মদীনা সনদের নৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি

'মদীনা সনদ' আজ থেকে ১৩৯৬ বছর পূর্বে দাস-সামন্ত ও উঠতি বণিক অর্থনীতির প্রতাপের কালে মানবিক সমঅধিকারের নীতিপুষ্ট একটি বহুত্ববাদী (pluralistic) সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের এক স্বেচ্ছাসম্মত দলিল, যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। এটা প্রণীত হয় ৬২২ খ্রি. মদীনা তথা ইয়াসরিব অঞ্চলে বসবাসকারী সুসংগঠিত পৌত্তলিক, প্রতিষ্ঠিত ইহুদী-খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী, অগ্নি উপাসক, সংশয়বাদী, নাস্তিক্যবাদী ও নব্য মুসলিমদের বিশ্বাসগত ধর্ম-সংস্কৃতি-আচার নির্বিশেষে মানবমণ্ডলীর পার্থিব-মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্জন ও সংরক্ষণের সম্মতিপত্র। সকল প্রকার স্বৈরী রাজতন্ত্র, শোষণ-পীড়ন-প্রভুত্ববাদী একনায়কতন্ত্রী শাসনবাদের ঊর্ধ্বে জনগণের সম্মতিভিত্তিক গণতান্ত্রিক-সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের সকল সামাজিক চুক্তিবাদের (social contract) প্রথম দৃষ্টান্ত, যা রাষ্ট্রতাত্ত্বিক দার্শনিক জন লক-এর সরকার-তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণঃ that government is the best one which is based on the consent of the governed. তবে 'নাগরিকদের সম্মতিপুষ্ট এই মদীনা সাধারণতান্ত্রিক সরকারের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তার দায়বদ্ধতা যেমন নাগরিকদের প্রতি, তেমনি রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্‌র কুরআনে বর্ণিত রবুবিয়াত (পালনবাদ) ও আদলে মোত্‌লাকের (সার্বজনীন বিচারসাম্য) অলংঘ্যণীয় নীতির প্রতি। কর্মব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ ন্যায়নীতির আলোকে আপাতঃ প্রয়োজনীয় পরিবর্ণিত কর্মকৌশল গ্রহণের এক্তিয়ার ঐ সরকারের থাকলেও মৌলিক মানবাধিকারের (যা কুরআনে বর্ণিত) বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটানোর ন্যূনতম অধিকার ছিল না। কারণ, (ক) কুল-মখলুকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ "রহমত করাকে নিজের জন্য কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন (৬:১২)," (খ) তিনি মানুষসহ সব প্রাণীর জন্য জীবিকার সংস্থান করেছেন, মানুষ এর খাজাঞ্চী নয় (১৫:১৯-২২); (গ) আমি আপনার রব্ ইহাদিগকেও এবং উহাদিগকেও বাঁচাবার সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি, আর আপনার রবের দান (কারো জন্য) বন্ধ নয় (১৭:২০)। অতএব, যাবতীয় মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ মানুষের জন্য রাখা হয়নি। আল্লাহ্‌র বিধান তথা প্রাকৃতিক আইনের কোন পরিবর্তন ও ব্যতিক্রম নেই (৩৫:৪৩ এবং ৪৮:২৩)। উপরন্তু আল্লাহ্ নিজের ওয়াদা বা বিধান নিজের উপরও অবশ্য পালনীয় করে রেখেছেন (১৬:৩৮)। অতএব, রিযিক, বাঁচবার অধিকার আল্লাহ্ প্রদত্ত। তবে, মানুষের কৃতকর্মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন (৩৫:৪৫), যা বহুত্ববাদী মানব সমাজ নির্মাণের পথে কোন অন্তরায় রাখেনি। মদীনা সনদের এটাই নৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি। রবুবিয়াত নীতিই এখানে প্রধান। রবুবিয়াত শব্দটা 'রব' সিফত থেকে উদ্ভূত এবং 'রব' শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা-বিবর্তনকর্তা (creator, sustainer, evolver : vide:

Arabic-English Lexicon : by Lane)। উপরন্তু রবুবিয়াত ও শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মকে রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মাচারগত বিভেদ-বিসম্বাদের উর্ধ্বেই রাখা হয়েছে।

২. মদীনা সাধারণতন্ত্রের জাতিগত সমস্যার সমাধান সূত্র

মদীনা সাধারণতন্ত্রের কিতাবী নাম ছিল দৌলতুম-মদীনা অর্থাৎ মদীনা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রনীতির বিচারে এটা বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং পৃথক পৃথক ধর্মপালনকারী জনগোষ্ঠীর একটা ফেডারেশন। এ রাষ্ট্রে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও ধর্মাচার পালনকারী জনগোষ্ঠীর বসবাসের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পরিবেশে বিভিন্ন জাতিসত্তার সামাজিক ঐক্য ও স্বার্থ সমন্বয়ের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হয়। মদীনা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর প্রথম কর্তব্য ছিল এ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক ঐক্যসূত্র নির্ধারণ করা। তিনি পার্থিব মৌলিক অধিকারের নীতির ভিত্তি হিসেবে রবুবিয়াত বা পালনবাদী দর্শনকে গ্রহণ করেন। অবশ্য এই পালনবাদী নীতির উৎসমূল তৌহিদ। মদীনা সনদে বাস্তবতার নিরিখে নিরেট ধর্ম ও ধর্মাচারের পরিবর্তে সার্বজনীন পালনবাদকে রাষ্ট্র ও সমতাবাদী সমাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মদীনা সনদ কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে সকলের বাঁচার, জীবন-জীবিকা ও সুবিচার পাবার, ধর্মাচার-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অলংঘ্যণীয় অধিকারের নিশ্চয়তা ঘোষণা করে, যা পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা দেয়। পালনবাদ ভিত্তিক এই নিরাপত্তা ধর্মবিশ্বাস-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে অভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার আস্থা ও প্রেরণা যোগায়।

কুরআনে মানব সমাজের জাতিগত বিভিন্নতার স্বীকৃতি দেওয়া আছে। অর্থাৎ বহুত্ববাদী সমাজের অন্যতম বাস্তবভিত্তি রচনা করে দিয়েছে কুরআন: "হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও; নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাবান: নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন (৪৯: ১৩; এতদসঙ্গে ২:২৪৫, ৫:৪৮, ১০:৯৯, ১৬:৯৩ আয়াত দ্রষ্টব্য)। অতএব, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'জাতি সমস্যার' একটা গ্রহণযোগ্য সার্বজনীন সমাধান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এছাড়া ধর্মাচার পালন, সংস্কৃতি এমনকি বিচার-আচারের ক্ষেত্রে এই মদীনা সাধারণতান্ত্রিক ফেডারেশনের ইউনিটগুলো অর্থাৎ গোত্র, জাতিগুলো পুরো স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করতো। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ভার রাষ্ট্রের প্রধান তথা অভিভাবকের হাতে ন্যস্ত রাখা হয় (সনদের ৩৭ ও ৩৮নং অনুচ্ছেদ)। তবে এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, জাতি ও দেশ সম্পর্কে বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের ধারণা, অন্যদিকে মার্কসবাদীদের ধারণা এবং কুরআনের সূত্রে বিবৃত ধারণার মধ্যে বহু বিষয়ে অনেক ফারাক। কুরআনে বিবৃত সূত্রগুলোতে একাধারে সার্বজনীনতা, বিশ্বজনীনতা এবং মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান।

এ প্রসঙ্গে গত শতকের অধুনালুপ্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব ও পরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, জাতিগত সমস্যা সমাধানে লেনিন তাঁর Right of Nations to

Self-Determination, The Significance of Self-Determination পুস্তকদ্বয়ে এবং স্তালিন ১৯২৩ সনে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে জাতিগত সমস্যা প্রসঙ্গে (Marxism and National and Colonial Question) যেসব যুক্তিসিদ্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিসিসাদি পেশ করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে সেগুলোর ফলপ্রসূ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতির যুগেও তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো জাতিগত অহমিকা, বিদ্বেষ, ধর্মগত দ্বেষ তথা সাম্প্রদায়িকতার বিষমুক্ত হতে পারেনি দীর্ঘ প্রায় ৭৫ বছরেও। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি-চরিত্র নির্মাণে ঘাটতির দরুণ রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো কাঁচের প্রাসাদের মতো ভেঙ্গে পড়ে। সেদিনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে (২০১৮ইং) ব্যক্তি পুঁজিবাদী, শোষণমূলক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু বড় বেদনার বিষয়, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার যে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব ঐসব রাষ্ট্রের পতনকালে প্রকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, তা অতীতে বহু গোঁড়া ধর্মীয় ফ্যাসাদ ও অসহিষ্ণুতাকেও হার মানায়। বর্ণবাদ এখনো বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সসহ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় প্রকট বললে অত্যুক্তি হয় না। গত ২৭ অক্টোবরের (২০১৮) পূর্ববর্তী ৭২ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের পিটাসবার্গে এক ইহুদী সিনাগগে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী হামলায় অন্ততঃ ১১জন ধার্মিক ইহুদীর প্রাণহানি ঘটেছে। আর এর বিপরীতক্রমে হতাহতদের সাহায্যার্থে নেমে আসেন মুসলিমরা। একই মাসে উগান্ডায় এক খ্রিস্টান পরিবারকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসেন এক মুসলিম ইমাম। সমাজতন্ত্র কিম্বা গণতন্ত্রের সমতাবাদী দর্শন দশকের পর দশকেও ধর্মীয় বিদ্বেষ দূর করতে পুরোপুরি সফল হয়নি। অন্যদিকে বর্ণ বিদ্বেষ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নবীজীর (দ.) আমলেই যেভাবে ঘৃণার বিষয়ে পরিণত হয়, সেই ঐতিহ্য এমনকি মুসলিম রাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও অক্ষুণ্ন থাকে এবং এখনো আছে। তবে গত প্রায় তিন দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী ঘুষপুষ্ট কিছু লোক বিভ্রান্তিমূলকভাবে তথাকথিত ধর্মীয় লেবাসে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিধরদের শোষণমূলক স্বার্থ হাসিলের পুতুল হিসেবে অপকর্ম চালাচ্ছে। অবশ্য তারা মুসলিম মানসে ঘৃণার বস্তু হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মুসলিম সমাজের সহনশীল চেতনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস মদীনা সনদ। মুসলিম পরিবারে শিশুরা প্রথম যে সাধারণ শিক্ষাটা পায়, তা'হলো: 'সব মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা। কাউকে ঘিন্ করোনা, ক্ষতি করোনা।' ধর্মীয়, জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিষেধক এভাবেই মুসলিম মানসে বপিত হয়।

৩. 'বেলায়তে মোত্‌লাকা'র গ্রন্থকার অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বিশ্লেষণে 'মুসলিম বিশ্বাসে সদা সক্রিয় অসাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ'

'বেলায়তে মোত্‌লাকা' আল-কুরআন ও নবীজীর (দ.) শাশ্বত শিক্ষা অবলম্বনে সাম্প্রদায়িকতাবাদ, বর্ণবাদ, ধনবৈষম্যবাদ বিমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ সমতাবাদী মানব সমাজ প্রত্যাশা করে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠে : সাধারণ অর্থে দৃশ্যতঃ 'ইসলাম' একটি 'ধর্ম' হিসেবে

বিবেচিত। তাহলে একটি 'ধর্মীয়তন্ত্র' বা 'বিশেষ ধর্মবাদীরা' কিভাবে ধর্মতঃ অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন? ইতিহাস, দর্শন ও বাস্তব অবস্থার আলোকে এর যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ দিয়েছেন হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে। মুসলিম দর্শনে নবুয়ত ও বেলায়ত অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত দুটো কল্যাণমুখী ধারা। নবুয়তের ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা আছে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী প্রিয় নবীর (দ.) মধ্য দিয়ে এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে তাঁর নবুয়তকে বলা হয় 'নবুয়তে আম্মা' যা সার্বজনীন বিশ্বমানবতার প্রতি প্রেরিত। অন্যপক্ষে বেলায়ত বা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পদ্ধতি সীমাবদ্ধতামুক্ত। তাসাওউফ দর্শনে 'বেলায়তকে নবুয়তের প্রাণ' বলা হয়। 'মোহাম্মদ ও আহমদ' নবীজীর (দ.) দু'টো তাৎপর্যপূর্ণ নাম। এই দু'নামের ব্যানারে মানবজীবনের দু'টো, তবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বাস্তব সত্তার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। তাঁর মধ্যে তানজীহ্' (সূক্ষ্ম) এবং তশ্‌বীহ (ব্যাপক, massive)-এর ইপ্সিত সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে। নবুয়ত ও বেলায়তের সমন্বিত পরম ও চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। 'নবুয়ত' হলো বিশেষ নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল প্রকাশ্য বিধানের ধারা, যা 'শরিয়ত' নামে চিহ্নিত। আর বেলায়ত হলো 'সীমাহীন, সার্বিক, কিন্তু সুশৃঙ্খল সূক্ষ্ম সামষ্টিক ও সার্বজনীন কল্যাণকর্ম প্রক্রিয়া। এর দু'টো শাখা; একটা বেলায়তে মোকাইয়াদা, অপরটা বেলায়তে মোত্‌লাকা। প্রথমটা প্রকাশ্য শরিয়ত সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামী বিধান ধর্মের বিষয়, যা মুসলিমদের অবশ্য পালনীয়। এটাকে বলা হয় "বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী"। অপরটার ক্ষেত্র সার্বজনীন; সমগ্র মানবমণ্ডলী তথা সৃষ্টজগৎ এর অন্তর্ভুক্ত, যা "বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী" রূপে চিহ্নিত। স্থূল বিশ্লেষণে নবীজীর (দ.) মক্কা জীবনে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী'র বিকাশ ঘটে এবং মদীনায় রাষ্ট্র পত্তন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে 'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর' বিস্তার ঘটে; যেখানে সকল মানুষের জাগতিক সমানাধিকার বর্তায়, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে Federation of Faiths বলা যায়, মদীনা সনদ যার অকাট্য দলিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিতে তৎকালীন ভারতের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সমাধানসূত্র হিসেবে খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী "ফেডারেশন অব ফেইথ"-এর তত্ত্ব পেশ করেন (দ্রঃ মওলানা মোহাম্মদ আলী: "মাই লাইফ"; রাজমোহন গান্ধী : আন্ডারস্ট্যান্ডিং মুসলিম মাইন্ড) যা অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হয়। তবে অন্যপক্ষ তৎকালে এমনকি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সাদামাটা ধারণাও গ্রহণ করেননি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবী জীবনেই যুগপৎ নবুয়ত এবং বেলায়তের যথাক্রমে মোকাইয়াদা ও মোত্‌লাকা উভয় রূপের সমাহার, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন ঘটেছে। এই সূত্র ধরে সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণ মূলে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) নবীজীর 'বেলায়তী মুদ্রা'র 'মোকাইয়াদা' পিঠের নমুনা হিসেবে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এবং 'মোত্‌লাকা' পিঠের নমুনা হিসেবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌কে (ক.) স্থাপন করে সপ্রমাণ করেছেন যে, "বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী"-র ইসলাম সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবন-বিধান এবং হযরত মোহাম্মদ (দ.)

বিশ্ব-মানবতার নির্ভরযোগ্য প্রতীক"। অতএব, ধর্মের প্রচলিত কোন সাধারণ সংজ্ঞায় 'ইসলামকে' আবদ্ধ করা যায় না এবং মৌলিক চরিত্র ও চেতনাগতভাবে তা সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন এবং তত্ত্বে ও প্রয়োগে অসাম্প্রদায়িক। অবরুদ্ধ জেরুসালেমের সমস্যা সাধনে হযরত ওমর ফারুকের (রা.) সামগ্রিক পদক্ষেপ এর অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ। এখানে নবীজীর (দ.) 'বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী' নীতিই কার্যকর, যার অন্তহীন সামিয়ানা তলে সকলেরই সমান ও নিরাপদ অবস্থানের নিশ্চয়তা বিধিবদ্ধ।

নবীজীর (দ.) ইসলামের এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ রেনাল ইসলামকে সব মানুষেরই ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। বাঙালি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী গোপাল হালদার তাঁর বিখ্যাত 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে বলেছেন: "ইসলামে তত্ত্ব কথার ও গোঁজামিলের স্থান নাই...ইসলাম পেশাগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে।" ইসলাম ধর্মের তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক প্রকৃত জরীপ করে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক পল ডিউজেন (জন্ম ১৮৪৫ইং) বলেন, "ইসলাম আদতেই কোন ধর্ম নয়। কারণ, তা খুব বেশী পার্থিব জগৎ ঘেঁষা এবং জীবন ও জগতের বাস্তবতা সমর্থন করে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও বাসনাগুলোকে পবিত্র বলে মনে করে।... অন্যপক্ষে সত্যিকার ধর্ম বা দর্শন মানুষকে অবশ্যই এসব থেকে দূরে রাখে।" বলা বাহুল্য, তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যেই ইসলাম ধর্মের বহুমুখী বাস্তব রূপ পরিস্ফুট!

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের দার্শনিক প্রেক্ষাপটে একেবারে সাদামাটাভাবে বলতে গেলে, বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী ব্যষ্টিক (micro) দৃষ্টিকোণে আচারগতভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অবশ্য এখানেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সকল জাগতিক অধিকার সুরক্ষিত। আর বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী বৈশিষ্ট্যগতভাবে সামষ্টিক (macro); অর্থাৎ মুসলিমসহ ধর্মমত ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণের জন্য। এই বেলায়তে মোত্লাকার প্রাথমিক ফলিত রূপ মদীনা সনদ যা একটি বহুত্ববাদী (pluralistic) মানব সমাজের বিশ্বজনীন রূপরেখা (universal pluralistic human society)। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, দেশ ও স্থানে ধর্মীয় আচারগত উম্মাদনার তাপপ্রবাহ মানব সমাজকে দগ্ধ করছে। তবে মহাবিশ্বের গতি-প্রকৃতি এই প্রত্যয় যোগায় যে, বিজ্ঞান-দর্শনের আরো বিকাশের ফলশ্রুতিতে মানসিকভাবে ও বাস্তবে মানবমণ্ডলী পরস্পরের আরো নিকটবর্তী হবে, সবাই মিলে এক পরিবারের মতো হবে, এমনকি মানবতাবাদী এক বিশ্ব নির্মাণও সম্ভাব্যতার বাইরে নয়। হতে পারে দার্শনিক লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেলের পরিকল্পিত একক বিশ্ব-সরকারের ধারণার বাস্তবায়ন। হতে পারে ফেডারেশন অব হিউম্যানিটি। নবীজী (দ.) তো বলেই রেখেছেন: "সমগ্র সৃষ্ট জগৎ আল্লাহ্‌র পরিবার।" এই পরিবার তথা 'ফেডারেশন অব হিউম্যানিটি' কার্যক্ষেত্রে কীভাবে ফলিত হবে, 'মদীনা সনদ' সেই ছকটাই এঁকে দিয়েছে।

৪. মদীনা সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ

৫৩টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট মদীনা সনদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা স্বাক্ষরিত হয় সংশ্লিষ্ট গোত্র তথা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং নবীজী (দ.) এতে স্বাক্ষর করেন কোন সমর-ক্ষমতার প্রতিভূ হিসেবে নয়; সর্বস্বীকৃত, জননেতা বা অভিভাবক, সততা ও বিশ্বস্ততার মূর্ত রূপ কল্যাণকামী একজন 'পরিপূর্ণ মানুষ' রূপে। অন্যদিকে ১২১৫ সালের ৬৩ অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট ম্যাগনা কার্টা স্বাক্ষরিত হয় রাজা ও সামন্ত প্রভূদের মধ্যে। মদীনা সনদে স্বীকৃত ছিল মানুষের ইপ্সিত জাগতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। ম্যাগনা কার্টার পথ ধরে 'পিটিশন অব রাইটস' (১৬২৮), 'বিল অব রাইটস' (১৬৮৮), 'হেবিয়াস কর্পাস আইন' (১৬৭৯) প্রভৃতি প্রণীত হতে সময় লাগে কয়েক শতাব্দী। তবে এগুলোতে জনগণের নিম্নতম বাঁচার অধিকারের গ্যারান্টি অস্পষ্ট। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৩০টি অনুচ্ছেদের ১৯টিতে (৩–২১) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার; ৬টিতে (২২–২৭), অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং ২টিতে দায়িত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সদস্য দেশগুলোর প্রভাবশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সে আর্থিক সমতাবাদ দূরে থাক, অভাবমুক্ত সমাজের ন্যূনতম প্রত্যাশা, এমনকি বর্ণ বৈষম্যবাদও এখনো পুরোপুরি নির্মূল হয়নি; অন্যদিকে শত বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুসলিম নাগরিক প্রধান রাষ্ট্রগুলো বর্ণবাদী বিষাক্ত ছোবল থেকে এখনো মুক্ত।

মদীনা সনদের ১১টি অনুচ্ছেদে (১১-১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৩) মুসলিমদের প্রতি আহ্বান রয়েছে পরস্পর সহনশীল, অঙ্গীকার রক্ষা, জালেমদের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য, সপক্ষীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহায়তা প্রদান, প্রতিহিংসাপরায়নতা ত্যাগ ও অন্যের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। এছাড়া ২৫-৩৬ এবং ৫১ অনুচ্ছেদে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে সব হঠকারিতা, চক্রান্ত পরিত্যাগ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণে দায়িত্বশীল হবার কথা বলা হয়েছে। ৩৭ ও ৩৮নং অনুচ্ছেদে রয়েছে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের নীতিমালা। এছাড়া নজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায় মদীনা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে যে সব নিয়ম, অধিকার ও কর্তব্য সংবিধানভুক্ত করা হয়, তার সমমর্যাদার কোন সনদ পরবর্তীকালে এখনো পর্যন্ত কোথাও সম্পন্ন হয়নি [দ্রঃ জে. ডেভেনপোর্ট, স্যার উইলিয়াম ম্যুর, ডব্লু. মন্টগোমারী ওয়াটের গ্রন্থাদি]। উল্লেখ্য, নাগরিকদের জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তার অধিকার কুরআন প্রদত্ত রবুবিয়াতের অলংঘ্যণীয় বিধানেরও অন্তর্ভুক্ত। 'প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যেসব অধিকার উপভোগ করেছিল, কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই তা রদ কিম্বা কেড়ে নিতে পারেনা' – আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানবেত্তা জনলক, ভলতেয়ার, রুশো, মন্তেস্কু প্রমুখের এই সূত্র বহু বছর আগেই মদীনা সনদে দায়েমী-কায়েমী করা হয়।

৫. মদীনা সনদ কি সংবিধান?

মদীনা সনদ মানুষের চিরন্তন অধিকারের দলিল। ভূমিকায় এটাকে 'কিতাব' বলে বর্ণনা করা হয়; আধুনিক অর্থে তা 'সংবিধান'। ২৩, ৪০, ৪৬, ৫১ অনুচ্ছেদে এটাকে 'সহীফা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যার আধুনিক অর্থও সংবিধান। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 'মদীনা সাধারণতন্ত্রের গঠনতন্ত্রই' প্রথম লিখিত সংবিধান। এই সংবিধান সমস্বয়ধর্মী এবং অন্যায্য আক্রমণাত্মক সহিংসতার বিরোধী।

৬. 'আমাদের কালেরই নবী মোহাম্মদ (দ.)'

পাশ্চাত্যে বিভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদ, অর্থবিভ্রাট প্রভৃতি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দরুন কুরআন ও নবীজী (দ.) সম্পর্কে অসত্য বিকৃত ধারণার প্রসার ঘটলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশেষ করে থিওলজিক্যাল বিষয়াদি ছাড়াও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক যথার্থ গবেষণা হচ্ছে। কায়েতানী, মন্টগোমারী ওয়াট, আলফ্রেড গিয়োম, ক্যারেন আর্মস্ট্রং প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিতে শাশ্বত আধুনিকতা, প্রতিনিধিত্বশীল জনগণতন্ত্র, আর্থিক-সামাজিক সমতাবাদ, অভাবমুক্ত নিরাপদ মানব জীবন ও সমাজ, বিশ্বমানবিকতা, বহুত্ববাদ, পারস্পরিক সহনশীলতা, শ্রদ্ধা ও কল্যাণপূর্ণ সহাবস্থান প্রভৃতির সূত্র ও দিগদর্শন আবিষ্কার করে নতুনভাবে মানুষের 'ধর্ম' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সংঘাত, সমস্যা, পীড়ন, শোষণ জর্জরিত বিগত শতাব্দীর বিংশৃঙ্খলা-সহিংসতার প্রতিকারের পথ অন্বেষণে নেমে খুঁজে পেয়েছেন, "কুরআনের সমতাবাদী চেতনা", "শান্তিবাদী-সহনশীল-সৌহার্দ্যবাদী নবী মোহাম্মদকে (দ.)" – যার নীতির কার্যকর প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল "মানবজাতির ভবিষ্যৎ"। 'ইসলাম ইন মডার্ন হিস্টোরী' গ্রন্থে ব্যক্ত উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথের অভিমতের সাথে সহমত পোষণ করে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন: "মুসলমানদেরকে যেমন পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে, তেমনি পাশ্চাত্যকেও এই মানসিক সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে যে, তারা সমমর্যাদার মানুষের সাথেই পৃথিবীতে বসবাস করছে, যারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।" গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সূচিত সংঘাত, অসহিষ্ণুতা, হিংস্র রক্তপাতে বিক্ষত বিশ্ব পরিবেশ থেকে মানব প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য বহু পাশ্চাত্য মনীষী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিকভাবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এবং চার্চকে ধর্মতাত্ত্বিকভাবে মানবজাতির অন্যান্য সদস্যদের সাথে মৌলিক শ্রদ্ধাসহকারে আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যথায় তাঁরা গত শতাব্দীর মতো একুশ শতকেও বৈশ্বিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবেন। এ প্রেক্ষিতে ক্যারেন আর্মস্ট্রং তাঁর Muhammed Prophet for Our Time গ্রন্থের উপসংহারে বলেন : The brief history of the twenty-first century shows that neither side has mastered these lessons. If we are to avoid catastrophe, the Muslim and western worlds must learn not merely to tolerate but to

appreciate one another. A good place to start is with the figure of Muhammed: a complex man, who resists facile, ideologically-driven categorization, who sometimes did thing that were difficult or impossible for us to accept, but who had profound genius and founded a religion and cultural tradition that was not based on the sword but whose name- 'Islam'-signified peace and reconciliation.

এখানে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের উৎকণ্ঠার প্রসঙ্গটাও এসে পড়ে। তাঁদের মতে আধুনিক পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থায়, পুঁজিবাদের চরম উন্নতি ঘটে ঊনবিংশ শতকে। তার বিকাশের সকল সম্ভাবনা ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু হয় তীব্র ক্ষয়ের যুগ। এখন সেখানে কেবল ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সংঘাত কিম্বা শ্রেণীর হাতে শ্রেণীর শোষণের আশঙ্কা নয়; বরং এখন মানব জীবনের প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা জাতিতে জাতিতে বৈরীর, ধ্বংসযজ্ঞের, শঠতা ও মিথ্যাচারের বেসাতির। উপরন্তু যে মানুষ এই আশ্চর্য সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, সেই মানুষের হাতেই তার নিশ্চিহ্নভাবে বিলুপ্তির আশঙ্কার এক অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর প্রারম্ভিক প্রকাশ হিসেবে সংঘটিত হয়েছে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানুষের পূর্বেকার ধ্যান-ধারণা, ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গেছে। এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মানুষের জন্য মুক্তি আর এগিয়ে যাবার পথ আবিষ্কার করতে উৎকণ্ঠিত মানবতাবাদী মানস। বলা বাহুল্য, নবীজী (দ.) বহু পূর্বেই মদীনা সনদের মাধ্যমে সে পথের দিশা দেখিয়ে গেছেন, যা অস্তিত্ববাদী দর্শনের (existentialism) বর্তমান উৎকণ্ঠাও দূর করতে পারে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর দাস ও সামন্ত অর্থনীতি ভারাক্রান্ত বিশৃঙ্খল আরব ভূমি তথা বিশ্বের সাথে এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, মরণাস্ত্র, শিল্প অর্থনীতির উন্নত কিন্তু উগ্র প্লুটোক্র্যাট, বিশৃঙ্খল বিশ্বের গুণগত পার্থক্য তেমন নেই। এই জটিল সমস্যার সুশৃঙ্খল সমাধানের সূচনা বিন্দু কি? ক্যারেন আর্মস্ট্রং ইতিহাস ঘেঁটে সেই সূচনা-বিন্দু স্থির করে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন: মুহাম্মদ (দ.) আমাদের কালের নবী (Muhammed Prophet for Our Time)। তিনিই সমতামণ্ডিত বহুত্ববাদী প্রত্যাশিত আগামী বিশ্বেরও দিশা। তিনি শাশ্বত এবং সকল অর্থেই আমাদের কালেরও নবী।

লেখক: প্রবীণ সাংবাদিক, গ্রন্থকার ও গবেষক।

একনজরে

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন

অধ্যাপক জহুর উল আলম

পুত-পবিত্র মানব বংশধারা থেকে মহানবী (দ.) এর আবির্ভাব

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) উল্লেখ করেন, "আমার বাপ-দাদার মধ্যে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোন যিনা-ব্যভিচার নেই, বরং সবাই বিবাহিত।" এ প্রসঙ্গে হাফিজ হায়সামী (রহ.) এ হাদীসকে নির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাঁর পূর্ব পুরুষদের নসবনামা পুত-পবিত্র। মাতৃ বংশলতিকা অনুযায়ী মহানবী (দ.) একই ভাবে পুত-পবিত্র। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, মহানবী (দ.) এবং উর্ধতন বংশধর হযরত নূহ্ (আ.) এর সন্তান 'সাম' এর অধস্তন পুরুষ। অর্থাৎ নৃগোষ্ঠীর দিক থেকে তিনি ছিলেন সেমিটিক।

পৃথিবী খ্যাত বংশ কুরাইশ এবং দু'যবীহ এর উত্তরাধিকারী হযরত মুহাম্মদ (দ.)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)। হযরত ইসমাঈল (আ.) এর অধস্তন পুরুষ হলেন ফিহর। তিনি কুরাইশ নামে পৃথিবীর ইতিহাসে সমধিক পরিচিত। কুরাইশ এর অন্যতম অধস্তন উত্তর পুরুষ হলেন 'হাশিম'। স্বীয় প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং কর্মদক্ষতার কারণে 'হাশিম' ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং প্রভাবশালী। হাশিম মানব সেবা, দয়া-দাক্ষিণ্যের কারণে জনপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁর পুত্র আবদুল মুত্তালিব দয়া-দাক্ষিণ্য এবং মানব সেবাকর্মে পিতার চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন। বংশ পরস্পরায় তাঁরা মদ্যপানকে হারাম করে নেন। যারকানীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ আছে, "আবদুল মুত্তালিবই সর্বপ্রথম হেরা গুহায় নির্জন ইবাদতের সূত্রপাত করেছিলেন।" কাবার হাতীমে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ সময়ের পর যমযম কুপ পুনঃ খনন করেন। যমযম কুপ খননের সময় আবদুল মুত্তালিব দশটি সন্তান লাভের জন্য কাবার মালিকের প্রতি বিনীতভাবে ফরিয়াদ পেশ করেন। দশটি পুত্র সন্তান লাভ করলে তিনি একটি সন্তান আল্লাহ্র দরবারে কুরবানী দানের অঙ্গীকার করেন। দশটি সন্তান লাভের পর অঙ্গীকার অনুযায়ী সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহ্র দরবারে কুরবানী দানের জন্য আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নাদিষ্ট হন। আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং রূপ লাবণ্যের অধিকারী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হযরত আবদুল্লাহ্। কুরবানী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে লটারী প্রদান করা হলে তিনবারই আবদুল্লাহ্র নাম আসে। প্রতিবারই উট কুরবানী প্রদানের শর্ত দিয়ে নাম উত্তোলন করার পর সবশেষ ১০০ উট কুরবানী প্রদানের পক্ষে লটারী উঠে। আবদুল মুত্তালিব সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ১০০টি উট কুরবানী দানের বিনিময়ে তাঁর প্রিয়তম পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্র জীবন রক্ষা করেন। একারণে হযরত মুহাম্মদ (দ.)'কে 'ইবনুয-যাবীহাইন' অর্থাৎ দু'যাবীহ এর সন্তান আখ্যায়িত করা হয়। 'যাবীহ'রা হলেন হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং পিতা হযরত আবদুল্লাহ্।

পিতার নাম প্রসঙ্গ

মহানবী (দ.) এর পিতার 'আবদুল্লাহ্' নামকরণ বিষয়ে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) মুসলিম শরিফের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন; "ঐ দু'টি নাম আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয়, একটি নাম আবদুল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়টি আবদুর রহমান।"

জন্মঃ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ

আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ্'র ঔরষে থেকে হযরত আমিনার গর্ভ হয়ে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট, ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সুবেহ সাদেকের সময় মহানবী (দ.) ভূমিষ্ঠ হন।

জন্ম সময়কালীন কিছু অলৌকিক ঘটনা

হযরত মুহাম্মদ (দ.) ভূমিষ্ঠ হবার ৫০/৫৫ দিন পূর্বে সংঘটিত হয় আসহাবে ফীলের ঘটনা। ইয়েমেনের শাসনকর্তা দুষ্কর্মা দুষ্ট দাম্ভিক এবং ভ্রষ্টাচারী আবরাহা পৃথিবীর প্রথম গৃহ পবিত্র কাবা ধ্বংসের জন্য বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালায়। এ সময় আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র গৃহ কাবা হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্র বলে ঘোষণা দেন। ফলে আল্লাহ্ আবরাহা এবং বিশাল হস্তীবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসমানী পক্ষী প্রেরণের মাধ্যমে ধুলিস্যাত করে দেন এবং কাবা গৃহ রক্ষা করেন। মহানবী (দ.) এর জন্মের রাত্রিতে সে সময়ের মহাশক্তিধর পারস্য (ইরান) সম্রাটের প্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ধসে পড়ে, হাজার বছর ধরে জলন্ত অগ্নিপূজকদের অগ্নিকুণ্ডটি নিভে যায়, সাওয়া নদী শুকিয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে জালেম-অত্যাচারী জন-নিপীড়ক রাজা-বাদশাহ-শাসকদের ভবিষ্যত পরিণতির ইঙ্গিতবাহী অনেক অলৌকিক ঘটনা তখন সংঘটিত হয়।

নামকরণ

উল্লেখ্য যে, ভূমিষ্ঠ হবার ছয়মাস পূর্বে মহানবী (দ.) পিতৃহারা হন। অর্থাৎ তিনি 'ইয়াতীম' অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। সপ্তম দিনে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৌত্রের আকীকা ও নামকরণ সম্পন্ন করেন। 'মুহাম্মদ' নামকরণ বিষয়ে আবদুল মুত্তালিব উপস্থিত সকলের সম্মুখে বলেন, "এ নাম আমি এ জন্য রেখেছি যে, যাতে আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিজীব এ নব জাতকের প্রশংসা করে।"

দুধপান বিষয়

শুভ জন্মের পর তিন/চারদিন তাঁর মা হযরত আমিনা তাঁকে দুধ পান করান। এরপর আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী 'সুয়াইবা' এবং সবশেষে আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের প্রথা অনুযায়ী হযরত হালিমা সাদীয়া দুধপান এবং লালনের জন্য স্বীয় গৃহে নিয়ে যান। হযরত মুহাম্মদ (দ.)-কে স্বীয় দায়িত্বে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র হালিমার পরিবারে 'বরকতের দরজা' উন্মুক্ত হয়ে যায়।

বক্ষ প্রসারণের ঘটনা

৫৭৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে হযরত আমিনার পুন: অনুমতি নিয়ে হালিমার গৃহে নেয়া হলে সেখানে ৪ বৎসর বয়সকালে মহানবী (দ.) এর বক্ষ প্রসারণের ঘটনা ঘটে। নবুয়তের মহামূল্যবান সম্পদ চিরস্থায়ীভাবে হেফাজতের জন্য তখন তাঁর দু'বাহুর মধ্যখানে 'মোহরে নবুয়ত' দিয়ে সীল করে দেয়া হয়।

শৈশব-কৈশরের জীবন প্রবাহ

৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মাতৃবিয়োগ, তখন মহানবী (দ.)-এর বয়স ৬ বৎসর।
৫৭৬ থেকে ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত দাদা আবদুল মুত্তালিবের দায়িত্বে লালন-পালন।
হযরত আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে ৫৭৯ থেকে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান।
৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া সফর এবং পাদ্রী বুহারা কর্তৃক শেষ নবী চিহ্নিত করণ।
৫৮৫-৫৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হারবুল ফেজার এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিলফ্ উল ফুযুল গঠন। স্বীয় উপার্জিত অর্থে গরীব-দুঃখীদের সাহায্য প্রদান।

আল আমীন পরিচিতি লাভ

শিষ্টাচার, সত্যকথন সর্বোপরি আমানতদারীতার কারণে মক্কার লোকেরা তাঁকে আল-আমীন নামে ডাকতেন। 'আল আমীন' সুপরিচিতির কারণে মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উপর অর্পন করেন। বসরায় একটি ছায়াদার বৃক্ষের নীচে বিশ্রামরত দেখে মহানবী (দ.)কে লক্ষ্য করে খ্রিস্টান দরবেশ নাস্তুরা উল্লেখ করেন, "ইনিই তিনি, ইনিই নবী, ইনিই শেষ নবী"।

৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রা.) সঙ্গে বিবাহ

তখন মহানবী (দ.) ছিলেন ২৫ বছরের পরিপূর্ণ যুবক, আর হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন ৪০ বছর বয়স্ক সতী-সাধ্বী সম্ভ্রান্ত মহিলা।

বিবাহের পর ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমশঃ অনীহা সৃষ্টি

ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদিজা (রা.) উম্মুল মোমিনীন হিসেবে গৃহে আগমনের পর মহানবী (দ.) এর সংসার জীবনের দায়িত্ব তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এর ফলে মহানবী (দ.) ক্রমশঃ জীবিকা উপার্জনের তাগাদা ও জাগতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি নানাবিধ কাজকর্ম এবং মানুষের কর্মাদির পরিণতি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তামগ্ন থাকতেন। এ সকল নৈর্ব্যক্তিক চিন্তায় তিনি প্রায়শ আল্লাহ্‌র স্মরণে একাত্ম হয়ে পড়তেন।

৬০৫ খ্রিস্টাব্দে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ

কাবা গৃহ পুনঃনির্মাণ এবং হাজারে আসওয়াদ যথাযথ স্থানে প্রতিস্থাপন বিষয়ে মক্কার গোত্রগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তিতে মহানবী (দ.) অতুলনীয় প্রজ্ঞার পরিচয় দেন।

৬১০ খ্রিস্টাব্দে হেরা গুহায় অবস্থান

বিবাহের পর অর্থ উপার্জনের প্রতি অনাসক্তি, প্রবল ধ্যানমগ্নতা এবং নির্জনে বসে আরাধনা অত্যধিক মাত্রায় উন্নীত হবার পর মহানবী (দ.) এর বয়স যখন তেত্রিশ তখন তাঁর হৃদয়ে পরম ভাবান্তরের সূত্রপাত ঘটে। ৩৫ বৎসর বয়সে মহানবীর (দ.) মধ্যে নির্জন অবস্থায় কালাতিপাতের আকাঙ্খা অনন্ত-অসীমত্বে পৌছে যায়। তখন তাঁর নয়ন জুড়ে অপূর্ব জ্যোতি দৃশ্যমান হতে থাকে। এ ধরনের মানসিক অবস্থায় নির্জন ধ্যানে আত্মনিমগ্ন হবার মানসে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেরা গুহায় দীর্ঘতর সময়ের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেন। এ গুহায় এক পর্যায়ে চল্লিশ দিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবী (দ.) এর বয়স ৪০ বৎসরে উপনীত হয়। তখন পবিত্র রমজান মাসে তাঁর সম্মুখে আল্লাহ্‌র 'ওহী' নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে নবুয়তের সুসংবাদ পেশ করেন এবং বলেন, "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল লাজি খালাক"। এ বাক্যটি তাঁর প্রতি প্রথম ওহী। এদিন ছিল ২৭ রমজান – পবিত্র কুরআন এদিনেই নাজিল হয়।

৬১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ্যে 'দ্বীন' প্রচারের নির্দেশ লাভ

নবুয়ত প্রকাশের প্রথম তিন বছর মহানবী (দ.) মক্কার পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে আল্লাহ্‌র নির্দেশে অতি সংগোপনে একান্ত বিশ্বস্তদের নিকট ইসলাম ধর্ম এবং তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওহী মারফত আদিষ্ট হন যে, "………এবং আপনি [মুহাম্মদ (দ.)] নিজের নিকট আত্মীয়বর্গকে পাপ ও আল্লাহ্‌দ্রোহিতার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিন" – (সূরা আশ্ শুয়ারা : ২১৪)। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে মহানবী (দ.) 'তাওহীদ' এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানালে পৌত্তলিক মূর্তিপূজকরা বিশেষতঃ কুরাইশ নেতা আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল প্রমুখ মহানবী (দ.)'কে 'ধর্মদ্রোহী', 'পাগল' প্রভৃতি বদ শব্দ মারফত উপেক্ষা এবং উপহাস প্রদর্শন শুরু করে। এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতিতে নানা ধরনের বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে সাফা পর্বতের পাদদেশে এক জন-সম্মেলনে মহানবী (দ.) উদাত্ত কন্ঠে তাওহীদের শাশ্বত বাণী, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্' ঘোষণা দিয়ে কুসংস্কার, কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করে সত্য-ন্যায়-প্রেম এবং পবিত্রতার পথ অনুসরণের আহ্বান জানান।

কুরাইশদের নির্যাতন

আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচারে প্রকাশ্যে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকলে মহানবী (দ.) স্বীয় গোত্রের মাধ্যমে চরম নির্যাতনের মুখোমুখি হন। বাণিজ্য এবং কাবা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশীদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করলে কুপমণ্ডুক কুরাইশ নেতারা তাঁর তীব্র বিরোধিতায় একাট্টা হয়ে দাড়ায়। এসময় আবু লাহাবের স্ত্রী এবং আবু জেহেলের স্ত্রী মহানবী (দ.)'র চলার পথে কাঁটা পুঁতে রাখত এবং তাঁর পবিত্র মস্তকে আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। এ সময় আবু জেহেল প্রস্তর নিক্ষেপ করে মহানবীর (দ.) পবিত্র মস্তকে আঘাত করে আহত করলে চাচা বীরকেশরী হযরত হামজা কাবা গৃহে প্রবেশ করে আবু জেহেলকে শাস্তি দিয়ে প্রকাশ্যে কলেমা তৈয়বা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময় কুরাইশ নেতারা অর্থ-বিত্ত, সুন্দরী রমণী, আরবের নেতৃত্ব প্রদান সহ লোভনীয় অঢেল প্রস্তাব তাঁর সম্মুখে পেশ করলে তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা দেন, "এরা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চন্দ্র এনে দেয় তবুও আমি চিরন্তন মহাসত্যের সেবা এবং নিজের কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হবো না।" সত্যের পথে অটুট থেকে তিনি দ্বীন প্রচার অব্যাহত রাখলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী গরীব-দুঃখী বেলাল, খাব্বার আম্মার, হারিস, ইয়াসির এবং তার স্ত্রী সুমাইয়ার উপর কুরাইশরা অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করে। উল্লেখ করা সঙ্গত যে এদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রথম শাহাদত বরণকারী হলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এর মাতা সুমাইয়া (রা.)।

৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের আবিসিনিয়া গমন (প্রথম হিযরত)

ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠলে মহানবী (দ.) নির্যাতিত মুসলমানদের দশটি পরিবারের একটি দলকে আবিসিনিয়ায় হিযরত করার নির্দেশ দেন। এরপর আরো ত্রিশটি পরিবার বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজ্য আবিসিনিয়া গমনপূর্বক অমানবিক নির্যাতন থেকে রক্ষা পান। এসময় নির্যাতিত মানুষ গুলোর বিরুদ্ধে কুরাইশ প্রতিনিধিরা গমন করে বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট অভিযোগ দায়ের করলে সত্যতা যাচাই করে বাদশাহ তাদেরকে মক্কা ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

৬১৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত আমীর হামজা (রা.) ও হযরত উমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণ

নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে হযরত আমীর হামজা ও হযরত ওমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে কুরাইশদের মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা, ক্রুদ্ধতা এবং জিঘাংসা তীব্রতর হয়ে যায়। কারণ তাঁরা দু'জনই ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী এবং অকুতোভয়। হঠাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কাবা গৃহে প্রকাশ্যে সালাতের আয়োজনে হযরত উমরকে সম্মুখে দেখে কুরাইশরা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

৬১৬ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (দ.)-কে সমাজচ্যুত করা

ক্রমশ: তরুণ-যুবকদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবল উৎসুক্য লক্ষ্য করে দ্বীন প্রচারে বাধাগ্রস্ত করার জন্যে মহানবী (দ.) এবং তাঁর গোত্র বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবকে সমাজচ্যুত ঘোষণা দিয়ে শেঁবে আবু তালিবে (আবু তালিবের উপত্যকা) অবরুদ্ধ করে রাখে। এসময় তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এমনকি তাঁদেরকে খাদ্য-দ্রব্য হতেও বঞ্চিত করা হয়। এ সময়ে অবরুদ্ধ মহানবী (দ.) এবং বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবের সদস্যবৃন্দ গাছের পাতা-ছাল-বাকল খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। এ ধরনের অগ্নিপরীক্ষার মুখেও মহানবী (দ.) আল্লাহ্‌র একত্ব ও মহত্ব প্রচারে অবিচল থেকেছেন। তিন বছর আবু তালিবের উপত্যকায় অবরুদ্ধ থাকার পর মক্কার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে এবং কাবা গৃহের দেয়ালে ঝোলানো কথিত চুক্তিপত্র "আল্লাহ্" শব্দ ব্যতীত বাকী সকল অংশ উই পোকায় বিনষ্ট করায় বাধ্য হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দ নবুয়তের দশম বর্ষ-আমুল হুজন (শোকের বর্ষ)

তিন বছর ব্যাপী কুরাইশদের অবরোধের অব্যবহিত পরে নবুয়তের দশম বর্ষে মহানবী (দ.) এর জীবনে নেমে আসে বেদনাদায়ক সময়। এ বৎসর প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী উম্মুল মোমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) এবং চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন। এ দু'জন পরমাত্মীয়ের ইন্তিকালে মহানবী (দ.) বিমর্ষ এবং বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ বিবি খাদিজার সার্বিক সহযোগিতা এবং চাচা আবু তালিবের সামাজিক প্রভাবের কারণে পরিণাম চিন্তা করে কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর বিষয়ে নির্মম সিদ্ধান্ত নিতে অনেক ক্ষেত্রেই সমীহ করতেন।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দে তায়েফ গমন

আবু তালিবের ইন্তিকালের পর আবু লাহাব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। স্বাভাবিক কারণে জালিম আবু লাহাব কুরাইশদেরকে সংগঠিত করে মহানবী (দ.)'র প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। নিপীড়ন এড়াবার জন্যে তখন মহানবী (দ.) তাঁর পালকপুত্র জায়েদকে নিয়ে তায়েফ গমন করেন। সেখানে তাওহীদের বাণী ঘোষণা করলে তায়েফের সর্দার প্রকৃতির লোকেরা উপহাস শুরু করে এবং কিছু দুষ্কৃতিকারী লম্পট ব্যক্তিকে লেলিয়ে দেয়। এর ফলে মহানবী (দ.) প্রস্তরাঘাতে আহত হন এবং শরীর থেকে রক্ত ঝড়তে থাকে। এ ধরনের নির্মম অত্যাচারের মুহূর্তেও মহানবী (দ.) পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে তায়েফবাসীর হেদায়ত ও কল্যাণের জন্য দোয়া করেন।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মেরাজ

মেরাজ শরিফ পৃথিবীবাসীর জন্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ স্বর্গ থেকে মর্তে এসেছে আল্লাহ্‌র নির্দেশে। আবার মৃত্যু পরবর্তীতে স্বর্গ-নরকে মানুষই নির্ধারিত নিয়মে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গমন করবে। ধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুযায়ী জানা যায় নবী হযরত ইদ্রিস (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) স্বশরীরে বেহেশ্‌তে প্রবেশের পর আর এখনো দুনিয়ায় আসেন নি। অথচ মহানবী (দ.) মেরাজ রজনীতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সঙ্গে 'উন্মুক্ত দীদার' শেষে পরম প্রশান্তি নিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথিবীর ই্‌তিহাসে অদ্যাবধি এ ধরনের চমকপ্রদ অলৌকিক ঘটনা আর ঘটে নি।

৬২০ খ্রিস্টাব্দে মদীনাবাসীর নিকট প্রথম দাওয়াত প্রেরণ: আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ

মহানবী (দ.) হজ্বের মওসুমে বিদেশীদের নিকট গোপনে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। ৬২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মদীনার খাযরাজ গোত্রের ছয়জন লোক হযরত মুহাম্মদ (দ.) ঘোষিত ধর্মনীতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। **৬২১** খ্রিস্টাব্দে আরো বারো জন মদীনাবাসী মহানবী (দ.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তাওহীদ প্রচারের অঙ্গীকার করেন। এটিকে বলা হয় আকাবার **১ম শপথ**। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনা থেকে আগত ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে মহানবী (দ.)-কে পূর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকার প্রদান করেন। এ ঘটনাকে বলা হয় আকাবার দ্বিতীয় শপথ।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিযরতের প্রস্তুতি

আকাবার দ্বিতীয় শপথের বিষয় কুরাইশরা জেনে গেলে মুসলমানদের উপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয়। পরে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অন্য সকলকে মদীনায় হিযরত করার জন্য মহানবী নির্দেশ দেন।

মহানবীকে (দ.) হত্যার পরিকল্পনা

এদিকে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং তরুণ যুবকদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় হিংস্র আবু জেহেলের নেতৃত্বে মক্কার প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নিয়ে গঠন করা হয় 'হত্যাকারী সংঘ'। এ বিষয়ে আবু জেহেল সিদ্ধান্ত দেয় যে, হত্যাকারী সংঘের সকল সদস্য এক সঙ্গে তরবারি চালিয়ে মহানবী (দ.)-কে হত্যা করবে। তবে বিভিন্ন সময় মহানবীকে (দ.) বিশাধিকবার হত্যা চেষ্টা চলে।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিযরত

হত্যাকারী সংঘের মাধ্যমে মহানবী (দ.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিযরতের জন্য ওহী আসে। মহানবী (দ.) এর গৃহ জালেম দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত আলী (রা.)-কে স্বীয় বিছানায় শায়িত রেখে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে মদীনায় হিযরতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তিন দিনব্যাপী অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি মদীনার নিকটবর্তী কুবা নামক স্থানে উপস্থিত হন। হযরত আলী (রা.) তাঁর উপর মহানবী কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করে কুবায় পৌঁছে একই সঙ্গে মিলিত হন। পরদিন তাঁরা ব্যাপক অভ্যর্থনার মধ্যদিয়ে মদীনায় প্রবেশ করেন। সেদিন ছিল ১২ রবিউল আওয়াল।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনা গমন করে তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। মূলতঃ এ মসজিদ ইসলাম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রিয় দপ্তর হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে।

মদীনা সনদ

দেশে-বিদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে মহানবী (দ.) বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র এবং জনসম্প্রদায়ের নির্বাচিত নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করে সকল মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিপূর্ণ মানবাধিকার সম্বলিত একটি সংবিধান রচনা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি প্রথম লিখিত সংবিধান। এ সংবিধান 'মদীনা সনদ' নামে সুপরিচিত।

'মদীনা সনদ' পরবর্তী কার্যক্রম

মদীনা সনদের আলোকে পৃথিবীর বুকে একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র কাঠামো এবং ব্যবস্থা (সামন্ত রাজতন্ত্রের দাপটে তটস্থ সমাজ ব্যবস্থার যুগে এটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা) গড়ে তোলেন। রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলেই তিনি বিদেশে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত পৌঁছানোর এবং জনসাধারণের মধ্যে এক স্রষ্টা নীতি তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ভিত্তিক (তাওহীদ) ঐক্য কামনা করে বিভিন্ন রাজা-বাদশা, শাসক, পুরোহিত, ধর্মনেতা, গোত্রনেতা এবং সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ বদরের যুদ্ধ

মদীনা রাষ্ট্র ব্যবস্থার আলোকে দেশ-বিদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের অনুকুল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ মদীনা হতে ৮০ মাইল দক্ষিণে ২৫৩ জন আনসার এবং ৬০ জন মুহাজির সহ ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে আক্রমণকারী কুরাইশদের প্রতিরোধ করার জন্য মহানবী (দ.) অগ্রসর হন। এ

যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। আল্লাহ্‌র অশেষ কুদরতে মুসলমানরা প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে ১৪ জন মুজাহিদের শাহাদতের বিনিময়ে কুরাইশদের পরাজিত এবং বিপর্যস্ত করেন। এ যুদ্ধ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "তুমি আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো, কিন্তু তোমরা কখনোই আক্রমণকারী হবে না" (সূরা বাক্বারা : আয়াতাংশ ১৯০)।

যুদ্ধবন্দী নীতি

বদরের যুদ্ধে পরাজিত কুরাইশ এবং বন্দীদের জন্য মহানবী (দ.) পৃথিবীর ইতিহাসে মানবাধিকারের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দী নীতি অনুসরণ করেন। বদর যুদ্ধে মহানবী (দ.) এর বিজয় এবং যুদ্ধনীতি অনুসরণ তাঁকে পৃথিবী ব্যাপী নতুনভাবে পরিচিত করে।

৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে অপমানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে উহুদ পাহাড়ের নিকট আক্রমণকারী হিসেবে কুরাইশরা উপস্থিত হয়। ৩০০ উস্ট্রারোহী এবং ২০০ অশ্বারোহী সহ ৩০০০ সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের লক্ষ্য ছিল মদীনা দখল করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে মুসলমানদেরকে মদীনা ত্যাগে বাধ্য করা। এ প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয়ের পথে এগিয়ে যায়। কিন্তু মালে গনিমত লাভের প্রত্যাশায় সম্পদ লাভের লক্ষ্যে লোভের বশীভূত হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা বিভাগ ছেড়ে চলে আসলে শত্রুদের পুনরাক্রমণের মুখে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে বীর কেশরী আমীর হামজা (রা.) সহ অনেক বীর মুজাহিদ শাহাদতবরণ করেন। যুদ্ধে মহানবী (দ.) এর পবিত্র দন্ত মোবারক শহীদ হয়। এ যুদ্ধে বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে মুসলমানরা সংশোধিত হবার দিক নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দে খন্দকের যুদ্ধ এবং নতুন রণকৌশল

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের নতুনভাবে সুসংগঠিত হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারে একাগ্রতা লক্ষ্য করে ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ, ইহুদী ও বেদুইনদের সমন্বয়ে ত্রিশক্তির দশসহস্র পদাতিক এবং ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। বিরাট সৈন্য বাহিনীর মোকাবিলায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট তিন হাজার। এ সময় ত্রিশক্তির আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে পারস্য থেকে আগত বিশিষ্ট সাহাবা হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর পরামর্শক্রমে মদীনার নিরাপত্তা বিধানের জন্য চতুর্দিকে পরিখা (খন্দক) খনন করা হয়। যুদ্ধের এ নব কৌশলের মুখে কুরাইশরা হতভম্ভ হয়ে পরিখার অপর পাশে তাবু খাটিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। দীর্ঘ সময় অবস্থানের পর এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে নিপতিত হয়ে কুরাইশরা বিধ্বস্ত অবস্থায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগে বাধ্য হয়।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হুদাইবিয়ার সন্ধি

মদীনা রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর কুরাইশদের বার বার আক্রমণের মুখে ইসলাম প্রচারের স্বাভাবিক প্রণালী তথা পৃথিবীবাসীর নিকট তাওহীদের বার্তা প্রেরণের কর্ম কৌশল বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। এদিকে মদীনায় হিযরতের পর ৬ বৎসর পর্যন্ত পবিত্র কাবা জিয়ারত এবং জন্মভূমি দেখার অধিকার বঞ্চিত থাকায় মহানবী (দ.) বিচলিত হয়ে ওঠেন। জন্মভূমি মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের আকাঙ্খা তীব্র হলে ১৪০০ সাহাবী সহযোগে মহানবী (দ.) মক্কা অভিমূখে যাত্রা করেন। হজ্বের উদ্দেশ্যে গমন করায় মুসলমানরা তেমন কোন যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে নেন নি। তীর্থযাত্রায় যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকলেও কুরাইশরা খালিদ এবং ইকরামার নেতৃত্বে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মহানবী (দ.) এর গতিরোধ করে। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমানরা সেখানে অবস্থান নেন। সার্বিক অবস্থা লক্ষ্য করে কাবা জিয়ারতের যাত্রা নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে মহানবী (দ.) কুরাইশদের উদ্দেশ্যে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে বায়াতুর রিজওয়ান

হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রশ্নে প্রথমবার কুরাইশদের পিছুটান হলে প্রস্তাব সমেত মহানবী (দ.) হযরত উসমান গনি (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত শেষে ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় মুসলমানদের ধারণা হয় যে, কুরাইশরা বিদ্বেষ বশতঃ হযরত উসমানকে (রা.) হত্যা করেছে। এসময় একটি বৃক্ষের নীচে মহানবী (দ.) এর পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে সমবেত সাহাবীরা হযরত উসমান (রা.) এর বিষয়ে প্রতিশোধ নিতে শপথ গ্রহণ করেন। মহানবী (দ.) এর একটি হস্তকে তখন হযরত উসমানের (রা.) হস্ত ঘোষণা করে হযরত উসমানের পক্ষেও শপথ গ্রহণ করা হয়। এ ঘটনাকে অনুসরণ করে ইসলাম ধর্মে বায়াত পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটে।

ফাতহুম মুবিন বা মহা বিজয়

পবিত্র কুরআনে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে মহা বিজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শর্তসমূহে আপাতত মুসলমানদের পশ্চাদপদতা পরিলক্ষিত হলেও চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় কুরাইশ কর্তৃক মদীনা রাষ্ট্র, ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম উম্মাহ আক্ষরিক ভাবে স্বীকৃত হয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, “হে নবী! আমি আপনার জন্যে সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছি” (সূরা ফাতাহ্ : ১)।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে খাইবার যুদ্ধ

মদীনা রাষ্ট্র এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হওয়ায় মদীনা সনদ অনুযায়ী শাস্তি স্বরূপ ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে মদীনার সীমান্তবর্তী খাইবার নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। সেখানে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে ইহুদীরা বেদুঈনদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে চার হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়। এমতাবস্থায় ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র নির্মূল করার লক্ষ্যে মহানবী

(দ.) ২০০ অশ্বারোহী সহ ১৬০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। খাইবারের দূর্গ জয়ে মুসলমানরা কয়েকবার ব্যর্থ হলে সবশেষে মহানবী (দ.) এর নির্দেশে মহাত্মা হযরত আলীর (রা.) হস্তে মুসলিম বাহিনীর পতাকা এবং নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। অতপর হযরত আলীর (রা.) সেনাপতিত্বে খাইবার এর প্রত্যেক দূর্গের পতন ঘটে। হযরত আলী (রা.) তখন "আসাদ উল্লাহ" (আল্লাহ্‌র সিংহ) উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁকে বিখ্যাত "জুলফিকার" তরবারি প্রদান করা হয়।

৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মুলতবী হজ্ব

হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী মহানবী (দ.) ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মুলতবী হজ্ব সম্পন্ন করেন।

৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মুতার যুদ্ধ

বিভিন্ন আক্রমণ ও প্রতিহিংসার মুখোমুখি হয়ে পড়ায় ৬২৮ থেকে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মুসলমানদেরকে ১৭টি ছোট-বড় অভিযানে ব্যস্ত থাকতে হয়। সিরিয়ার সামন্ত রাজা কর্তৃক মহানবী (দ.) প্রেরিত দূত শহীদ হলে বিশ্বাসঘাতকদের দমনের জন্য ৩০০০ সদস্য সমেত সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। এ যুদ্ধে মহানবী (দ.) এর দত্তকপুত্র জায়েদ বিন হারিস (রা.), চাচাত ভাই হযরত জাফর তাইয়ার (রা.) এবং আবদুল্লাহ্‌ (রা.) শহীদ হন। পরবর্তীতে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এর সেনাপতিত্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ "সাইফুল্লাহ্‌" খেতাবে ভূষিত হন।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধি লংঘন করায় মহানবী (দ.) জন্মভূমি মক্কায় প্রত্যার্পনের লক্ষ্যে অতি সংগোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি, ১০ রমজান অষ্টম হিযরীতে মহানবী (দ.) দশ সহস্রাধিক সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে জন্মভূমি মক্কা বিজয় করেন। সে দিনই পবিত্র কাবা গৃহ থেকে ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করে কাবা শরিফকে তাওহীদের অনির্বাণ কেন্দ্রবিন্দু ঘোষণা দেন। মক্কা বিজয়ের পর সমবেত জনগণের সম্মুখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মহানবী (দ.) সকলের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করে উল্লেখ করেন যে, এ দাওয়াত গ্রহণ অথবা বর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদের বাণী মানা-না মানা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। এটি মানলে পরকালে মুক্তি বা নাজাত, না মানলে পরকালে অবধারিত শাস্তি তথা জাহান্নাম। মহানবীর ভাষণ শ্রবণের পর গগনবিদারী আওয়াজে সমবেত সকলে কলেমা তৈয়বা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (দ.)-কে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হুনাইনের যুদ্ধ, তায়েফ জয়, তাবুক অভিযানে ব্যস্ত থাকতে হয়। ৬৩০ এবং ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (দ.) বিভিন্ন গোত্র এবং ধর্মীয় এলাকায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে ইসলাম ধর্মের মূলবাণী, আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে বিদায় হজ্ব

পৃথিবীর ইতিহাসে মানব মুক্তির লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা সম্বলিত যে কয়টি ভাষণ নন্দিত হয়ে আছে এর মধ্যে বিদায় হজ্বের সময়ে আরাফাত ময়দানে সোয়া লক্ষ মানুষের সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণ অতুলনীয়। হজ্ব সমাপন করে প্রদত্ত এ ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (দ.) ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, শাসক, শাসিত নির্বিশেষে মানবাধিকার সম্পর্কিত যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন জাতির পক্ষে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব এবং সদ্ভাবের ভিত্তিতে বিচার সাম্য প্রতিষ্ঠা করে সমাজ সংহতি বজায় রাখা সহজতর হবে।

গদীরে খুম এর ঘোষণা

বিদায় হজ্বের পর ১৮ জিলহজ্ব মহানবী (দ.) মদীনা ফেরার পথে গদীরে খুম নামক স্থানে সমবেত হাজীদের উদ্দেশ্যে একভাষণে হযরত আলী (রা.) এর মর্যাদা ঘোষণা কালে উল্লেখ করেন, "আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।"

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন, ১১ হিজরী ১২ রবিউল আওয়াল ওফাত

বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী (দ.) তাঁর পার্থিব জীবনের অন্তিম সময় সম্পর্কে আভাস দেন। মহান আল্লাহ্ প্রেরিত আখেরী নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (দ.) মাত্র ৬৩ বৎসরের পার্থিব জীবনে বহুবিধ-বহুমাত্রিক বাধা, বিঘ্ন এবং আক্রমণ প্রতিহত করে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার এবং কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে অদৃশ্য জগত থেকে অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন সুসম্পন্ন করে পরম বন্ধুর (আল্লাহ্) সঙ্গে অপার মিলনে পাড়ি জমান।

মহানবী (দ.) এর পরিবার পরিজন

মহানবী (দ.) এর প্রথম পত্নী হলেন ১. হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। তাঁর জীবদ্দশায় মহানবী (দ.) আর কোন পাণি গ্রহণ করেন নি। তাঁর ওফাতের পর ২. হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.), ৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), ৪. হযরত হাফসা (রা.), ৫. হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.), ৬. হযরত সালমা (রা.), ৭. হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.), ৮. হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.), ৯. হযরত হাবীবা (রা.), ১০. হযরত সাফিয়া (রা.), ১১. হযরত মায়মুনা (রা.)-কে শাদী করেন। মহানবী (দ.) এর সতী সাধ্বী পত্নীগণ উম্মু'ল মোমিনীন হিসেবে প্রত্যেক মুসলমানের নিকট সম্মানিত। হযরত আয়েশা (রা.) ব্যতীত অন্য সকলেই ছিলেন বিধবা। এছাড়া হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) স্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথক হুজরায় অবস্থান করেন এবং উম্মুল মোমিনীন অভিধায় ভূষিত হন।

মহানবী (দ.) এর সন্তান-সন্ততিগণ

১. হযরত আবুল কাসেম (রা.), ২. হযরত যায়নাব (রা.), ৩. হযরত রুকাইয়া (রা.), ৪. হযরত উম্মে কুলসুম (রা.), ৫. হযরত সৈয়দা ফাতিমা (রা.) – উনারা সবাই হলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) এর গর্ভজাত সন্তান। ৬. হযরত ইব্রাহীম (রা.), ইনি হলেন হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.) এর গর্ভজাত সন্তান।

সন্তানদের মধ্যে একমাত্র হযরত সৈয়দা ফাতিমা জোহ্‌রা (রা.) মহানবী (দ.) এর বেসালের পর ওফাত লাভ করেন। অন্য সবাই হুজুর (দ.) এর পার্থিব জগতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ওফাত হন। হযরত মাওলা আলীর (রা.) ঔরশজাত এবং মা ফাতিমা তুজ্‌ জোহরা (রা.) এর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারীরাই আওলাদে রাসূল (দ.) হিসেবে সম্বোধিত এবং সম্মানিত।

পাক পাঞ্জাতন

পাক পাঞ্জাতন তাঁরাই যাঁদেরকে কোন প্রকার নাপাকি কখনো স্পর্শ করেনি। যে কোন অবস্থায় তাঁদেরকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা পবিত্র কাবা গৃহে প্রবেশের অধিকার প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। এঁরা হলেন ১. আখেরী পয়গম্বর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.), ২. হযরত সৈয়দা ফাতিমা জোহরা (রা.), ৩. হযরত আলী (রা.), ৪. হযরত হাসান (রা.) এবং ৫. হযরত হোসাইন (রা.)।

মহানবী (দ.) এর সমগ্র জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন একদিকে স্রষ্টার, অন্যদিকে সৃষ্টির। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সরাসরি সংযুক্তির কারণে তিনি স্রষ্টার হয়ে সৃষ্টির প্রতি যেমন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন, একইভাবে সৃষ্টির পক্ষ থেকেও তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশকারী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। অর্থাৎ মহানবী (দ.) হলেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মহিমাময় যোগসূত্র। মোটকথা তাঁর পার্থিব জীবন আধ্যাত্মিকতার অনির্বাণ স্রোতধারা হিসেবে জাগতিকতা এবং পারলৌকিকতার সমন্বিত জীবনব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ নির্দেশনা।

লেখক: অধ্যাপক, লেখক, গবেষক ও সদস্য সচিব, মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

[**প্রতিপাদ্যসারঃ ১২** রবিউল আওয়াল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ পৃথিবীতে শুভাগমন করেন। এ মিলাদুন্নবী (দ.) তারিখে অধিকাংশ মুসলমান খুশি উদ্‌যাপন করেন তথা ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালন করেন। প্রথম তিন যুগে বর্তমানের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে ঈদ এ মিলাদুন্নবী (দ.) পালিত না হলেও পরবর্তীতে চার মাযহাবের সর্বজন স্বীকৃত উলামা কেরাম ঈদ এ মিলাদুন্নবী (দ.) পালন করেছেন এবং কেউ কেউ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর কিতাবও রচনা করেছেন। শত শত বছর ধরে পবিত্র মক্কা মদীনাসহ পৃথিবীর সকল ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যাপক আকারে ঈদ এ মিলাদুন্নবী (দ.) পালিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমানে কেউ কেউ এটিকে বিদআত কাজ মনে করে ঈদ এ মিলাদুন্নবী (দ.) পালন করা থেকে বিরত থাকছেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আলোচ্য প্রবন্ধে শরীয়তের আলোকে ঈদ এ মিলাদুন্নবীর (দ.) গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।]

ভূমিকাঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আগমনের দিন কেবল মুসলমান নয় সৃষ্টিজগতের সকলের জন্য আনন্দের ও রহমতের। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন– আমি আপনাকে জগতসমূহের রহমত করে প্রেরণ করেছি। তাই সৃষ্টির সূচনা কাল থেকে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। যেহেতু ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হলো মুসলিম জাতির আনন্দের দিন। সেহেতু সারা বিশ্বের মুসলিমগণ অত্যন্ত ভক্তি ও মর্যাদার সাথে রবিউল আওয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উদ্‌যাপন করে থাকেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা শরঈ ঈদ। আর এটি খুশির ঈদ। এটি একটি শরীয়ত সম্মত পুণ্যময় আমল। যা কুরআন, সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সর্বজন শ্রদ্ধেয় উলামা কেরামের মধ্যে কেউ এটিকে মুসতাহসান আবার কেউ কেউ এটিকে মুস্তাহাব আমল বলেছেন। অত্র প্রবন্ধে আমরা প্রথমে ঈদ এ মিলাদুন্নবীর (দ.) পরিচয়, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ঈদে মিলাদুন্নবীর (দ.) সপক্ষে দলীল, সাহাবায়ে কিরামের স্বীকৃতি, সালাফে সালেহীন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি।

১. ঈদে মিলাদুন্নবী পরিচিতিঃ

ক. শাব্দিক পরিচয়: 'ঈদে মিলাদুন্নবী' – তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। **এক.** ঈদ **দুই.** মিলাদ **তিন.** নবী।

প্রথমতঃ ঈদ শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ উৎসব, আনন্দ, খুশি।

বিশ্ববিখ্যাত অভিধান প্রণেতা ইবনু মনযুর বলেন– 'সমবেত হবার প্রত্যেক দিনকে ঈদ বলা হয়'।[১]

মুফ্‌তি আমীমূল ইহসান আলাইহির রাহমাহ বলেন– 'কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে স্মরণের দিন বা সমবেত হবার দিনকে ঈদের দিন বলা হয়'।[২]

দ্বিতীয়তঃ মিলাদ শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ: জন্মকাল, জন্মদিন। এ অর্থে মাওলিদ শব্দের ব্যবহার আরবি ভাষায় অত্যধিক।

তৃতীয়তঃ নবী, এখানে নবী বলতে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মুসলিমজাতি ও পুরো সৃষ্টিজগত তাঁর আগমনের শোকরিয়া আদায় করে।

সুতরাং 'ঈদে মিলাদুন্নবী' অর্থ নবী করিম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আগমনের আনন্দ।

খ. 'মিলাদুন্নবী' শব্দের প্রচলন:

'মিলাদুন্নবী' শব্দের মধ্যে 'মিলাদ' শব্দটি কারো জন্ম বা জন্মকাল বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে হাদীস শরীফে, অভিধান গ্রন্থে, ইতিহাস গ্রন্থে; এমনকি অনেক কিতাবের নামেও। এটি নতুন কোন শব্দ নয়। এর কয়েকটি ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) অভিধান গ্রন্থে:

আল্লামা ইবনু মনযুর তার সুপ্রসিদ্ধ আরবি অভিধান 'লিসানুল আরব'-এ লিখেছেন– 'কোন লোকের মিলাদ সে সময়ের নাম যে সময়ে সে জন্ম গ্রহণ করেছে।[৩]

(২) হাদিস গ্রন্থে:

ইমাম তিরমিযী আলাইহির রাহমাহ রচিত 'আল জামেউস সহীহ' গ্রন্থের একটি বাবের শিরোনাম হল– 'নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জন্ম সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়ের অধ্যায়।'[৪]

হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কুবাছ বিন উশাইমকে জিজ্ঞেস করলেন–

'আপনি বড় নাকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমার চেয়ে বড়। আর আমি জন্মের হিসেবে তার চেয়ে অগ্রজ।'[৫]

(৩) ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মদিনায় হিজরতের সময় 'সাওর' গুহায় আশ্রয় নেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা তাকে খটুজতে খটুজতে 'সাওর' গুহা মুখে পৌছলে তাদের একজন বলল– 'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর জন্মের পূর্ব থেকে এ গুহামুখে মাকড়সার জাল রয়েছে। অতঃপর তারা চলে গেল।'[৬]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জন্ম বুঝানোর জন্য ‘মিলাদুন্নবী’ শব্দটির ব্যবহার সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি রয়েছে; মিলাদ শব্দটি এ যুগের নবসৃষ্ট কোন শব্দ নয়। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করে যে ‘মিলাদুন্নবী’ একটি ইদানিংকার শব্দ। যা আদৌ সঠিক নয়।

গ. ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’র (দ.) পরিচয়:
‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলতে এ ধরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শুভ আগমনে আনন্দিত হওয়া এবং এ অদ্বিতীয় নিয়ামত পাবার কারণে সৎকাজ ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করাকে বুঝায়।

২. ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন:

ক. কুরআন মাজীদের আলোকে:
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্ববাসীর জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এতে কারো দ্বিমত নেই। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের কোনটির জন্য বান্দাদেরকে খোটা দেননি কিন্তু রাসূলুল্লাহ্র নিয়ামতের উপর খোটা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–
‘আল্লাহ্ মুমিনদের ওপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন।’[৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর জন্য বড় অনুগ্রহ ও নিয়ামত। এ কারণে আল্লাহ্ তায়ালা এ বড় অনুগ্রহ তথা রাসূলুল্লাহ্কে পাবার ওপর খোটা দিয়েছেন।

যদি মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন বলতে নবীর জন্মকে স্মরণ করা এবং তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয় তবে এ মিলাদুন্নবী স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে পালন করেছেন। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে পঁচিশজন নবী রাসূলের মধ্যে হযরত আদম, হযরত মূসা, হযরত ইয়াহ্‌হিয়া, হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালামের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত ইয়াহ্‌হিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– ‘তাঁর প্রতি শান্তি যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন’।[৮]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইয়াহ্‌হিয়া আলাইহিস সালামের জন্মকালের কথা উল্লেখ করে ‘মিলাদুন্নবী’ পালন করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্ম সম্পর্কে ইরশাদ করেন–
‘অবশ্যই তোমাদের (আরবগণ) মধ্য থেকেই (বংশ থেকে) তোমাদের নিকট এসেছেন এক রাসূল। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।’[৯]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ আরবদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাদের নিকট তাদের বংশ থেকেই এক মহান রাসূল এসেছেন। এখানে আসার অর্থ হল জন্মগ্রহণ করা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম তথা 'মিলাদুন্নবীর (দ.) কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আগমনের কথা বর্ণনা করেছেন।

মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা মানে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে তাঁর দেয়া নিয়ামতের শোকরিয়া জ্ঞাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন–
'সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'[১০]

আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকরিয়া জ্ঞাপন করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। শোকরিয়া জ্ঞাপনের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। কিছু ধরণ মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

ক. আল্লাহ্‌র নিয়ামত নিয়ে আলোচনা করা: যেমন পবিত্র কুরআন মজীদে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্ তাআলা বলেন– 'হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি'।[১১]

পবিত্র কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন– 'আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন'।[১২]

খ. ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা: আল্লাহ্‌র নিয়ামত পাবার দিনকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমেও নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা যায়। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন–
'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করুন; এটি আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হবে ঈদ স্বরূপ এবং আপনার নিকট হতে নিদর্শন।'[১৩]

বনী ইসরাঈলের ওপর খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা রবিবারে অবতীর্ণ হবার কারণে সে দিনকে যদি ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা যায়, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের দিনকে কেন ঈদের দিন হিসেবে পালন করা যাবে না? অথচ তিনিই হলেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

গ. খুশি উদ্‌যাপন করা. আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের শোকরিয়া জ্ঞাপনের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল নিয়ামতের ওপর খুশি উদ্‌যাপন করা। তাই আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

'(হে রাসূল) আপনি বলুন, (সবকিছু) আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং তারা (মুসলমান) যেন খুশি উদ্‌যাপন করে। তারা যা সঞ্চয় করছে তা থেকে এটিই শ্রেষ্ঠতর।'[১৪]

আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা মাহমূদ আলুসী[১৫], ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী,[১৬] ইমাম আবু হাইয়ান আনদুলসী[১৭] হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন যে এখানে 'ফাদলুন' দ্বারা জ্ঞান এবং 'রাহমাতুন' দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য।

এ তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম হবে– তোমরা রাসূলুল্লাহ্ নামক নিয়ামত পাওয়ার কারণে খুশি উদ্‌যাপন কর। যা তোমাদের সব সঞ্চয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।

খ. হাদিস শরীফের আলোকে:

বিশ্বখ্যাত ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী আলাইহির রাহমাহ বলেন– শাইখুল ইসলাম, হাফিযুল আছর, আবুল ফদল ইবনু হাজর আসকালানীকে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের মূল ভিত্তি আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরিফে রয়েছে। সেই ভিত্তিটা হল– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফ আগমন করলেন। তিনি সেখানে ইয়াহুদিদেরকে আশুরার দিনে রোযা রাখতে দেখে তাদেরকে এ রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তারা বলল, এ দিনে আল্লাহ্ তায়ালা ফিরআউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন আর হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে মুক্তি দিয়েছেন। এ কারণে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে রোযা রাখছি।'[১৮]

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী আলাইহির রাহমাহ আশুরার হাদীসকে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উদযাপনের গ্রহণযোগ্য ভিত্তি মনে করেছেন এবং তা প্রতি বছর পালনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। সুতরাং, 'ঈদে মিলাদুন্নবী' (দ.) উদ্‌যাপন করা শরীয়ত সম্মত একটি সৎকাজ।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে– 'খায়বরবাসী আশুরার দিনে রোযা রাখত। তারা সেদিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করত। তারা তাদের স্ত্রীদেরকে এদিন অলংকার এবং সুন্দর পোশাক পরাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (মুমিনদের) বললেন! তোমরাও এদিন রোযা রাখ।'[১৯]

এ বর্ণনা থেকে আরো স্পষ্ট হয় যে, খায়বরবাসীরা আশুরার দিনকে ঈদের দিন হিসেবে নতুন কাপড় পরে রোযা রেখে উদ্‌যাপন করত। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মুসলমানদেরকে এদিন পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যা থেকে ইমাম ইবন হাজার 'আসকালানী মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দলীল গ্রহণ করেছেন।

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন– 'রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, সেদিন আমার জন্ম হয়েছে, আমি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি এবং আমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।'[২০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এভাবে প্রতি সোমবারে রোযা রেখে নিজের জন্মদিন পালন করেছেন।

৩. হযরত আউস বিন আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন– 'তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে শুক্রবার শ্রেষ্ঠতর দিন। কেননা, এ দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[২১]

অন্য হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

'নিশ্চয় শুক্রবার হল ঈদের দিন।'[২২]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন– 'নিশ্চয় এ দিনকে (শুক্রবার) আল্লাহ্ তায়ালা মুসলিমদের জন্য ঈদের দিন নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি জুমার নামায পড়তে আসে, সে যেন গোসল করে আসে আর তার কাছে যদি সুগন্ধি থাকে, তাহলে সে যেন তা থেকে কিছু শরীরে লাগিয়ে আসে। আর এদিন তোমাদের মিসওয়াক করা প্রয়োজন।[২৩]

যদি শুক্রবার হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার কারণে উত্তম দিন এবং ঈদের দিন হয়, তাহলে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবীর তথা বিশ্বনবীর আগমনের দিনকে কেন ঈদের দিন হিসেবে মানা যাবে না? হাদিসের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্মদিন আমাদের জন্য অবশ্যই ঈদের দিন হবে।

৪. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন– 'নবুয়ত প্রকাশের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আকীকাহ করেছেন।'[২৪]

অন্য বর্ণনায় হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন– 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হিসেবে প্রকাশ পাবার পর নিজে আকীকাহ করেন।'[২৫]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী (রহ.) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দাদা রাসুলুল্লাহর জন্মের সপ্তম দিনে তার আকীকাহ করেছেন। কারো আকীকাহ দু'বার হয় না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার আকীকাহ আল্লাহ্ তায়ালার শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' এবং উম্মতের কাছে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্র শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে নিজের ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজের জন্মের জন্য দ্বিতীয়বার

আকীকাহ করে শোকরিয়া আদায় করেছেন সেহেতু উম্মত হিসেবে রাসূলুল্লাহ্‌র জন্মদিন উপলক্ষে শোকরিয়া আদায় করা কর্তব্য বিশেষতঃ মুসলিম ভাইদের একত্রিত করে খানা খাওয়ানো এবং ঈদ উদযাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শোকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের জন্যও মুস্তাহাব।[২৬]

৫. সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে–

'আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার পরিবারের কাউকে (হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) স্বপ্ন দেখানো হল যে, সে খারাপ অবস্থায় আছে। স্বপ্নদ্রষ্টা তাকে বলল, তোমার কী অবস্থা? আবু লাহাব বলল, আমি অত্যন্ত আযাবের মধ্যে আছি; তবে (রাসূলুল্লাহ্‌র জন্মের ওপর খুশি হয়ে) ছুয়াইবাহকে মুক্তি দেয়ার কারণে (সেদিন তথা সোমবার) আমাকে ঠান্ডা পানীয় পান করানো হয়।'[২৭]

ইমাম ইবনু হাজর 'আসকালানী আলাইহির রাহমাহ ইমাম সুহাইলী আলাইহির রাহমাহ থেকে বর্ণনা করেন– হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, সে খুব খারাপ অবস্থায় আছে। অতঃপর সে বলল; তোমাদের ছেড়ে আসার পর আমি কোন শান্তি পাইনি; তবে প্রতি সোমবার আমার শাস্তি কিছুটা কমানো হয়। কারণ সেদিন সোমবারে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দাসী ছুয়াইবার কাছে শুনে তাকে (আনন্দিত হয়ে) স্বাধীন করে দিয়েছে।[২৮]

উপরিউক্ত হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝা যায়–
এক. আবু লাহাব হল প্রথম সারির কাফির, যার নিন্দায় আল্লাহ্ তায়ালা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে রাসূলুল্লাহ্‌র জন্মের ওপর ভাতিজা হিসেবে খুশি হয়ে তার দাসী ছুয়াইবাকে স্বাধীন করে দেয়ার কারণে কবরে তার শাস্তি প্রতি সোমবার কমানো হয়। ভাতিজা হিসেবে সে রাসূলুল্লাহ্‌র জন্মের ওপর খুশি হবার কারণে যদি তার শাস্তি কমানো হয়, তাহলে মুমিনরা আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে যিনি সবচেয়ে বড় নিয়ামত তাঁর ওপর খুশি হয়, তাহলে তার উত্তম প্রতিদানের পরিমাণ কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। (সূয়ূতী)
দুই. কাফিরদের কোন সৎকাজের প্রতিদান পরকালে দেয়া হবে না। কারণ তাদের ঈমান নেই। এরপরও আবু লাহাবকে সৎকাজের প্রতিদান কিভাবে দেয়া হল তার উত্তরে ইমাম কিরমানী বলেন–
'কাফিরদের সৎকাজ যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর প্রতিদান দেয়া হয় যেমন আবু তালিব (রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতের কারণে) কম শাস্তি ভোগের মাধ্যমে উপকৃত হয়।[২৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনুয জাযরী আলাইহির রাহমাহ বলেন– কাফির আবু লাহাব যার নিন্দায় কুরআনের একটি সূরা (সূরা লাহাব) অবতীর্ণ হয়েছে সে যদি 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উদযাপনের কারণে কম শাস্তি ভোগ করে, তাহলে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সে মুসলিম ব্যক্তির কী প্রতিদান হতে পারে যে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উদ্‌যাপন করে এবং এ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌র প্রেমে তার সামর্থ অনুযায়ী খরচ করে? আমার জীবনের কসম করে বলছি– দয়াময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার প্রতিদান হল, আল্লাহ্‌ তাকে 'জান্নাতুন নয়ীমে' প্রবেশ করাবেন।[৩০]

উপরিউক্ত হাদিস সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী আলাইহির রাহমাহ বলেন– এ হাদীস 'ঈদে মিলাদুন্নবী' উদ্‌যাপনকারী এবং এর জন্য সম্পদ ব্যয়কারীদের দলীল। আবু লাহাব যার নিন্দায় কুরআনের একটি সূরা (লাহাব) অবতীর্ণ হয়েছে সে যদি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্মের ওপর খুশি হয়ে তার দাসী (সুয়াইবা) কে স্বাধীন করে দেয়ার কারণে শাস্তি কম ভোগ করে, তাহলে সে মুসলিমের কী অবস্থা হবে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র ভালবাসা নিয়ে 'ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)' উদ্‌যাপন করে এবং ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনে সম্পদ ব্যয় করে? তবে মন্দ বিদয়াত যেমন নাচ, গান, হারাম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত; কেননা এগুলোর কারণে [মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনের] বরকত পাওয়া যাবে না।[৩১]

আল্লামা আব্দুল হাই লাকনভী বলেন–
যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্মের ওপর খুশি হবার কারণে আবু লাহাবের মত কাফিরের শাস্তি কমে গেল, তখন রাসূলূল্লাহর উম্মতের মধ্যে যে রাসূলুল্লাহ্‌র জন্মের ওপর খুশি উদ্‌যাপন করবে এবং তাঁর প্রেমে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনে সামর্থ অনুযায়ী খরচ করবে সে কেন সুউচ্চ মর্যাদা পাবে না?[৩২]

হাফিয শামসুদ্দিন আদ দামেস্কী বলেন– 'এ কাফির (আবূ লাহাব) যার নিন্দা করা হয়েছে সূরা তাব্বাত ইয়াদায় যে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্মে খুশি হওয়ায় প্রত্যেক সোমবার তার আযাব কমানো হয়। তবে, সে মুমিন বান্দার কী আনন্দ হবে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর পুরো জীবন খুশি ছিল এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে'।[৩৩]

গ. মিলাদুন্নবী (দ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট আলিমগণের অভিমত:

ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষে উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায়। তা থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল এবং হাদীস ভাষ্যকার ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী আলাইহির রাহমাহ ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে এর কিয়দংশ উল্লেখ করা হল। তিনি বলেন–

'অনুসরণীয় সূফি **আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আব্দুর রহীম বিন জামায়াহ্‌** আলাইহির রাহমাহ যখন মদিনা শরিফ ছিলেন, তখন তিনি মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষে খাবার তৈরী করে

মানুষদের খাওয়াতেন আর বলতেন– 'আমার পক্ষে যদি সম্ভব হত, তাহলে পুরো মাস জুড়ে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করতাম।' আমি মোল্লা আলী ক্বারী বলছি– আমি যেহেতু (ইবনে জামায়াহর মত সম্পদ ব্যয় করে) মূর্ত যিয়াফত করতে অক্ষম সেহেতু (ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনে) এ ক'টি পৃষ্ঠা লিখলাম, যাতে এ গুলো এমন অপ্রকাশ্য যিয়াফত হয়ে যায়, যা শুধু মাস বা বছর নয়; বরং যুগ যুগ ধরে চলমান থাকবে। আর এর (পৃষ্ঠাগুলো) নাম রাখলাম 'আল-মাওলিদুর রভী ফি মাওলিদিন্ নবী।'[৩৪]

২. 'রুহুল বয়ান' গ্রন্থকার আল্লামা ইসমাঈল হক্কী আলাইহির রাহমাহ বলেন–

'শরিয়তে নিষিদ্ধ নয় এমন কাজ না করে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা রাসূলুল্লাহ্ কে সম্মান করার নামান্তর। ইমাম সূয়ূতী বলেন, মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য শোকরিয়া জ্ঞাপনের বহিঃপ্রকাশ করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।'[৩৫]

৩. শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী আলাইহির রাহমাহ বলেন–

'মিলাদুন্নবী'র মাসে (রবিউল আওয়াল) মুসলিমগণ সর্বদা মিলাদ-মাহফিল করে আসছেন, খানা-পিনার ব্যবস্থা করে থাকেন, বিভিন্ন প্রকারের সদকা খায়রাতের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে আসছেন, অধিক নেক-আমল করেন এবং মিলাদুন্নবীর (দ.) ঘটনাবলী বর্ণনা করে আসছেন।[৩৬]

৪. আল্লামা শাহ আব্দুল রহীম দেহলভী আলাইহির রাহমাহ বলেন–

'মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি প্রতি বছর খানা-পিনার ব্যবস্থা করতাম; কিন্তু এক বছর তেমন খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে না পেরে কিছু ভাজা চনাবুট মানুষদেরকে দিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন দেখলাম যে আমার ভাজা চনাবুট তাঁর সামনে আছে আর তিনি আনন্দিত।'[৩৭]

৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী আলাইহির রাহমাহ বলেন–

'ইতিপূর্বে আমি মিলাদুন্নবী উদযাপনের সময় মক্কা শরিফ ছিলাম যখন মানুষেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওপর দরুদ পাঠ করছিলেন এবং সেই ঘটনাসমূহ বর্ণনা করছিলেন, যা তাঁর বিলাদত শরীফের সময় এবং বিলাদতের পর প্রকাশ পেয়েছিল। অতঃপর আমি দেখতে পেলাম যে মাহফিলের ওপর আলো বর্ষণ শুরু হয়েছে। আমি বলছি না যে, এ দৃশ্য শুধু চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছি আর এটা বলছি না যে, আমি শুধু অন্তরের চক্ষু দ্বারা দেখেছি। (অর্থাৎ উভয় চোখ দ্বারাই তা আমি দেখেছি) আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞাত আছেন এসময় আমি চিন্তা করে বুঝতে পেরেছি যে, মূলতঃ নূরের তাজাল্লিসমূহ আসছে মাহফিলে নিয়োজিত ফেরেশ্তাদের থেকে। আমি আরো দেখতে পেলাম যে, ফেরেশ্তাদের নূরের তাজাল্লির সাথে আল্লাহ্র রহমতও অবতীর্ণ হচ্ছে।'[৩৮]

৬. মুফতি ইনায়াতুল্লাহ কাকুরভী আলাইহির রাহমাহ বলেন–

হারামাইন শরিফাইন এবং অধিকাংশ ইসলামী দেশে রবিউল আওয়াল মাসে মুসলিমরা মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করেন, মুসলমানদেরকে একত্র করে মিলাদ-মাহফিলের ব্যবস্থা করেন, অধিক পরিমাণে দরুদ শরিফ পাঠ করেন এবং পানাহার বা ফিরনীর ব্যবস্থা করেন। মূলতঃ এটি অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং এটি রাসূলুল্লাহ্‌র ভালবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম।[৩৯]

৭. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কী আলাইহির রাহমাহ বলেন–

মিলাদ শরিফ পালনের ব্যাপারে আমাদের উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করে থাকেন। এতদসত্ত্বেও আলেমগণ তা বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। এটি বৈধ হবার পন্থা থাকা সত্ত্বেও তারা কেন এত কঠোরতা প্রদর্শন করে তা আমার জানা নেই! আমাদের জন্য হারামাইন শরিফাইনের অনুসরণই যথেষ্ট।[৪০]

৮. মাওলানা আব্দুল হাই লাকনভী বলেন–

যে কোন সময় বৈধপন্থায় মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা সওয়াবের কাজ।[৪১]

ঘ. যুগে যুগে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)

মক্কা মুকার্‌রামায় মিলাদুন্নবী (দ.)

শত শত বছর থেকে মক্কা নগরীতে মিলাদুন্নবী উদযাপিত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। 'আল ইলাম বিইলামি বায়তুল্লাহিল হারাম' গ্রন্থে বর্ণিত আছে–

'১২ রাবিউল আওয়াল প্রত্যেক বছর মাসজিদে হারামে সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হত। সকল এলাকার উলামা ফোকাহা গভর্নর এবং চার মাযহাবের কাযীগণ মাগরিবের নামাযে মাসজিদে হারামে একত্রিত হতেন। নামাযের পর সকলই সাওকুল লায়ল তথা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্মস্থান জাঁকজমকের সাথে যিয়ারত করতেন। তাদের হাতে অসংখ্য মোম, ফানুস ও লাইট থাকত।'[৪২]

ইমাম সাখাভী (ইন্তিকাল-৯০২হি.) বর্ণনা করেন, মিলাদুন্নবীর (দ.) দিন মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জন্মস্থানের (সাওকুল লায়লের) দিকে রাওনা হতেন। যেন তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এ ঈদের দিন তারা সকলেই একত্রিত হয়ে উদ্‌যাপন করত। বিশেষতঃ হিজাযের আমীরের জন্য নির্দিষ্ট আসন করা হত। মক্কার কাযী আলবুরহানী আশ শাফেঈ অসংখ্য মানুষের জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন।[৪৩]

ইমাম সাখাভী আরো বলেন, আমি মক্কা মুকাররমায় কয়েক বছর মিলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম। যা ছিল অতীব বরকতময়। এসময় আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্মস্থান যিয়ারত করেছি। যদিও এ মিলাদুন্নবীর (দ.) আমল প্রথম তিন যুগে ছিল না। এটি ভাল নিয়্যতে পরবর্তীতে শুরু হয়েছে। মুসলমানদের বড় বড় শহরে এ পুণ্যময় কাজ বড় জাঁকজমকের সাথে করা হয়। খানাপিনার ব্যবস্থা করে, সদকা খায়রাত করে খুশি উদ্‌যাপন করা হয়।[৪৪]

মদীনা শরীফে মিলাদুন্নবী (দ.)

মোল্লা আলী ক্বারী বলেন– 'মাদীনাবাসী (আল্লাহ্ তাদেরকে বরকত দান করুন) বড় গুরুত্বের সাথে মিলাদুন্নবী পালন করত'।[৪৫]

মিসর ও সিরিয়ায় মিলাদুন্নবী

মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বেশি গুরুত্বের সাথে পালন করা হত মিসর ও সিরিয়ায়। বছরের এ সময় মিসরের বাদশাহ এক উঁচু স্থানে আরোহন করে মিলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত হতেন। ইমাম ইবন জাযরী (রহ.) বলেন, আমি ৭৮৫ হিজরী সনে বাদশাহ বারকুক[৪৬] কর্তৃক অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম। আমি এ মাহফিল দেখে বড় খুশি হয়েছি। সে মাহফিলে আমার শরিয়ত বিরোধী কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে মাহফিলে উলামা কেরাম প্রখ্যাত ক্বারী ও নাত খাঁ উপস্থিত ছিলেন তাদের জন্য বাদশাহ দশ হাজার মিসকাল স্বর্ণ খরচ করেন।

আল্লামা আস সাখাভী বলেন, মিসরের বাদশাহ আবু সাঈদ জাকমুক[৪৭] মিলাদুন্নবী মাহফিল বড় গুরুত্বের সাথে পালন করতেন।

স্পেনে মিলাদুন্নবী (দ.)

মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর কিতাবে স্পেনের মিলাদুন্নবীর (দ.) বর্ণনা দিয়ে বলেন–
'স্পেনের মুসলিম শাসকরা মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাতের বেলায় কাফেলা নিয়ে বের হতেন দেশের বড় বড় উলামা কেরাম সে কাফেলায় শরীক হতেন। রাস্তায় সাধারণ মানুষও যুক্ত হতো। এসব কাফিরদের কাছে ইসলামের বাণী বুলন্দ করার জন্য করা হতো। আমার ধারণা রোমান সাম্রাজ্যোর বাদশারাও মিলাদুন্নবী উদযাপনে পিছিয়ে ছিলেন না। তারাও মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বড় বড় মাহফিল করতেন।'[৪৮]

ইরবিলে মিলাদুন্নবী (দ.)

আল্লামা ইবন কাসীর (রহ.) তাঁর বিদায়া নিহায়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন– ইরবিলের বাদশাহ আবূ সাঈদ মুযাফফর একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি মিলাদুন্নবী উপলক্ষে রবিউল আওয়াল মাসে আযীমুশ্ শান মাহফিলের আয়োজন করতেন। সিবত ইবনুল জাওযী তার মিরাতুয যামান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, বাদশাহ মুযাফফরের মিলাদুন্নবীতে উপস্থিত থাকা এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, তাঁর দস্তরখানায় পাঁচ হাজার ভুনা ছাগল, দশ হাজার মুরগী, এক লাখ মাটির পেয়ালা এবং ত্রিশ হাজার মিষ্টির থালা ছিল। সে সময়ের বড় বড় উলামা কেরাম সূফী সাধক তাঁর মাহফিলে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর স্ত্রী রাবীয়া খাতুন বর্ণনা করেন, আমার ভাই সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী (ইন্তিকাল-৫৮৯ হি.) আমাকে বাদশাহ মুযাফ্ফরের সাথে বিয়ে দেন। আমার স্বামীর পরিধানের কাপড় পাঁচ দিরহামের বেশি মূল্যবান ছিল না। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি পাঁচ দিরহামের নিম্ন দামের কাপড় পরিধান

করে বাকী সম্পদ সাদকা করতে এবং প্রতি বছর ৩ লাখ দিনার মিলাদুন্নবী মাহফিলের জন্য খরচ করতে আমার জন্য শ্রেয় মনে করি।[৪৯]

হিন্দুস্থানে মিলাদুন্নবী (দ.)

মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর 'আল মাওরিদুর রবী ফি মাওলিদিন নবি' গ্রন্থে বর্ণনা করেন- 'বড় বড় লেখক ও গবেষক আমাকে বলেন যে, হিন্দুস্থানে অন্যান্য স্থানের চেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ মিলাদুন্নবী পালন করা হত।[৫০] হিন্দুস্থানে মিলাদুন্নবীর (দ.) মাহফিলে উলামা কেরামের কেউ অনুপস্থিত থাকতেন না। তাঁরা মিলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত হয়ে ফয়জ বরকত হাসিল করতে চেষ্টা করতেন। একবার বাদশাহ হুমায়ুন (মৃত্যু-১৫৫৬ খ্রি.) চেয়েছিলেন সে সময়কার শায়খ যয়নুদ্দিন মাহমুদ হামদানী আন নাকশবন্দীর দরবারের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে আর্থিক সাহায্য করবেন। কিন্তু শায়খ তাঁর এ দান গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। বাদশাহ তাঁর উজিরকে বলেন, যেভাবেই হোক মাহফিলের ব্যবস্থা করা হোক। উজির জানতে পারলেন যে, শায়খ মিলাদুন্নবীর (দ.) মাহফিল ছাড়া কোন মাহফিলে উপস্থিত হন না। তাই উজির বাদশাহ হুমায়ুনের কাছে বলেন যে, খানা পিনার ব্যবস্থা করা হোক মিলাদুন্নবীর (দ.) নামে মাহফিল অনুষ্ঠান করলে শায়খ উপস্থিত হবেন। কথা অনুযায়ী বাদশাহ মাহফিল করলেন এবং শায়খ নাকশ্বন্দী তাঁর ভক্ত মুরীদ নিয়ে মাহফিলে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ বড় আদবের সাথে লোটা নিলেন এবং উজির চিলমচি নিলেন তারা দুজনে মিলাদুন্নবী মাহফিলে শায়খের হাত ধুইয়ে আপ্যায়ন করলেন। মিলাদুন্নবীর (দ.) প্রতি এ আদবের কারণে আল্লাহ্ তাআলা উভয়কে জগতে বড় সম্মান দান করেছেন।[৫১]

৬. মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের রচনাবলীঃ

মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা নিম্নে বিশিষ্ট কয়েকজন প্রসিদ্ধ উলামার রচনা উল্লেখ করলাম।

১. ইমাম ইবন জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.) তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। মাযহাবের দিক থেকে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পাঁচ শতাধিক কিতাব রচনা করেন। মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর তিনি একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। তাঁর রচিত কিতাবের নাম– 'আল মাওলিদুল আরুস'।[৫২]

২. ইবন দাহইয়া আল কালবী (৫৪৪-৬৩২ হি.) তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়া, মিসর, ইরাক ও খোরাসানসহ বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র সফর করেন। পরবর্তীতে তিনি মিসরে স্থায়ী হন। তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তাঁর রচিত মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর কিতাবের নাম 'আত তানভীর ফি মাওলিদিস সিরাজিল মুনির'।

৩. ইবন আব্দুল্লাহ আল জাযরী (ইন্তিকাল-৬৬০ হি.) তিনি শাফেঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম– 'উরফুত তারীফ বি মাওলিদিশ শরীফ'।

৪. ইবন কাসীর (ইন্তিকাল-৭৭৪ হি.) এ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসও মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর কিতাব রচনা করেছেন। যা ড. সালেহ উদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।[৫৩]

৫. হাফিয ইরাকী (৭২৫-৮০৮ হি.) আব্দুর রাহীম ইবন হোসাইন হাফিয ইরাকী একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁর রচিত মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর কিতাবের নাম– আল মাওরিদিল হানি ফিল মাওলিদিল সানি।

৬. হাফিয দামেস্কী (৭৭৭-৮৪২ হি.) মুহাম্মদ ইবন আবি বকর আদ দামেস্কী আশ শাফেঈ একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তিনি দামেস্কের দারুল হাদীস আশ শরফিয়ার শায়খুল হাদীস ছিলেন। তিনি মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।

(১) জামি‘ঈল আছার ফি মাওলিদিল মোখতার
(২) আল লাফজুর রায়িক ফি মাওলিদি খাইরিল খালাইক
(৩) মাওরিদিস সাদি ফি মাওলিদিল হাদী।

৭. হাফিয সাখাভী (৮৩১-৯০২ হি.) হাজী খলিফা তার কাশফুয যুনুন গ্রন্থে বর্ণনা করেন এ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর ‘মাওলিদিন্নাবী (দ.)’ নামক একটি কিতাব রচনা করেন।

৮. ইমাম সূয়ূতী (৮৪৯-৯১০ হি.) তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র মিলাদের উপর ‘হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ’ কিতাব রচনা করেন– তাঁর এ কিতাবটি বর্তমানে আল হাভী লিল ফাতাওয়া গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯. ইবন হাজার মাক্কী (ইন্তিকাল-৯৭৪ হি.) আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল হায়তামী আল মাক্কী যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর দু‘টি গ্রন্থ রচনা করেন।

১. ‘ঈন্দা যিকরিল মাওলিদ সায়্যাদুল আনামি তাহরিরিল কালাম ফি ক্বিয়াম
২. তোহফাতুল আখইয়ার ফি মাওলিদিল মোখতার।

১০. মোল্লা আলী ক্বারী (ইন্তিকাল-১০১৪ হি.) তিনি মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কিতাবের নাম– আল মাওরিদির রাওয়ী ফি মাওলিদিন্নাবী।

এছাড়া অনেকে কবিতায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মিলাদের উপর কিতাব রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে আব্দুল কারীম আল বারনজির (ইন্তিকাল-১১৭৭ হি.)–ইকদুল জাওহার ফি মাওলিদিন নবী আল আযহার ও আল্লামা ইউসূফ নাবহানীর (ইন্তিকাল-১৩৫০ হি.)–জাওয়াহিরুন নাযম আল-বাদী ফি মাওলিদিশ শাফী প্রসিদ্ধ।
তাজুদ্দিন আল-লাখমী আল-ফাকেহানী মিলাদুন্নবীর (দ.) বিরুদ্ধে আল-মাওরিদ ফিল কালাম আলা আমলিল মাওলিদ কিতাব রচনা করেন। ইমাম সূয়ূতী তাঁর কিতাব হুসনুল মাকসাদে বিস্তারিতভাবে ফাকেহানীর কিতাবের জবাব দিয়েছেন।

উপসংহারঃ

আমাদের আসলাফ আলেমগণ যারা সত্যিকার দ্বীনের ধারক বাহক ছিলেন তাঁদের কেউ ঈদে মিলাদুন্নবীর (দ.) বিরোধিতা করেননি। বরং তাঁদের অধিকাংশই মিলাদুন্নবীর (দ.) উপর কিতাব লিখে মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তারা নিজেরাও ঈদ এ মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন করে এর ফয়য ও বরকত হাসিল করেছেন। এ উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত আলেম শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহ্‌ মুহাদ্দেস দেহলভী তাঁর 'আদ দররুস সমীন' গ্রন্থে তাঁর পিতা মুহাদ্দিস আব্দুর রহীম দেহলভীর ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, আমার পিতা প্রতি বছর সামর্থ অনুযায়ী অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালন করতেন। একবার অভাবের কারণে কেবল চনা দিয়ে ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালন করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাসি মুখে তাঁর চনা গ্রহণ করেছেন।[৫৪]

হক্কানী রব্বানী উলামা কেরামের অনুসরণে এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনে আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে তাউফিক দান করুন।

তথ্যসূত্রঃ

১. ইবনু মনযুর, লিসানুল আরাব, দারু সাদির, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, খ. ৩য়, পৃ. ৩১৫।

২. মুফতি আমীমূল ইহসান, কাওয়ায়িদুল ফিকহ, আশরাফি বুক ডিপু, ভারত, ১ম সংস্করণ, ১৩৮১ হিজরী, পৃ.৩৯৫।

৩. ইবনু মনযূর, প্রাগুক্ত, খ. ৩য়, পৃ. ৪৬৮, আল্লামা ইসমাঈল বিন হাম্মদ জাওহারী, আস-সিহাহ, দারুল ইলম, বৈরুত, ১৪০৪ হিজরী, খ. ১ম, পৃ. ৩০৬।

৪. ইমাম তিরমিযী, আল-জামেইস সহীহ, দারুল গারব আল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৮ইং, খ. ৫ম, পৃ.৫৮৯।

৫. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত; ইমাম তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মূলুক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৭ হি. খ. ১ম, পৃ. ৪৫৩; ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৯ হিজরী, খ. ২য়. পৃ. ২১৬; মিয্‌যী, তাহযীবুল কামাল, মুয়াস সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, ১৪০০ হিজরী, খ. ২৩, পৃ. ৪৬৭; আহমাদ বিন আমর শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, দারুর রাইয়া, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪১১ হিজরী, খ. ১ম, পৃ. ৪০৭।

৬. ইবনে সাদ, আত্‌ তাবকাতুল কুবরা, দারু বৈরুত লিত্‌-তাবয়া ওয়ান নশর, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৮ হি. খ. ১ম, পৃ. ২২৮; ইমাম সূয়ূতী, আল-খাছায়িছুল কুবরা, মাকতাবাতু নূরিয়্যা রিজকিয়্যা, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, ১৯৯৮ ইং, খ. ১ম, পৃ. ৩০৫।

৭. সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৬৪।

৮. আল-কুরআন, সূরা মরিয়ম, আয়াত নংঃ ১৫।

৯. প্রাগুক্ত, সূরা. তাবাহ, আয়াত নংঃ ১২৮।

১০. আলকুরআন, সূরা-বাক্বারা, আয়াত নং ১৫২।

১১. আল-কুরআন, সূরা-বাক্বারা, আয়াত নং ৪৭।

১২. আল-কুরআন, সূরা. দুহা, আয়াত নং: ১১।
১৩. আল-কুরআন, সূরা. মায়িদা, আয়াত নং: ১১৪।
১৪. আল কুরআন, সূরা. ইউনূস, আয়াত নং: ৫৮।
১৫. আলূসী, রুহুল মায়ানী, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল 'আরাবী, লেবানন, বৈরুত, খ. ১০ম, পৃ.১৪১।
১৬. সূয়তী, আদ্ দুররুল মনছুর, দারুল মা'রিফা, লেবানন, বৈরুত, খ. ৪র্থ, পৃ. ৩৩০।
১৭. আবু হাইয়ান, আল বাহরুল মুহীত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, বৈরুত, খ. ৫ম পৃ. ১৪৮।
১৮. ইমাম সূয়ূতী, হুসনুল মাক্বছাদ, ফি আমলিল মাওলিদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৫হি., পৃ. ৬৩; ইমাম সূয়ূতী, আল হাবী লিল ফাতাওয়া, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২১ হিজরী, খ. ১ম, পৃ. ১৮১।
১৯. ইমাম মুসলিম, সহীহ, হাদিস নং: ১১৩১।
২০. প্রাগুক্ত, হাদিস নং: ১১৬২; ইমাম বায়হাক্কী, আস্-সুনানুল কুবরা, মাকতাবাতু দারিল বায, মক্কা শরিফ, ১৪১৪ হিজরী, হাদিস নং: ৮১৮২।
২১. ইমাম আবু দাউদ, আস সুনান, হাদিস নং: ১০৪৭; ইমাম ইবনু মাজাহ্, হাদীছ নং: ১০৮৫।
২২. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, হা. নং: ৮০১২; ইমাম হাকিম, আল-মস্তাদরাক, দারুল বায লিন-নশর ওয়াত্তাওযী, মক্কা শরিফ, সৌদি আরব, হাদিস নং. ১৫৯৫।
২৩. ইমাম ইবনু মাজাহ্, হা.নং ১০৯৮; ইমাম তাবরানী, আল-ম'জামূল আওসাত্ব, মাকতাবাতুল মারিফ, রিয়াদ, ১৪০৫ হি. হা. নং ৭৩৫৫।
২৪. ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানুল কুবরা, হা. নং: ৪৩; ইমাম ইবনু হাজর আসালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯ম, পৃ. ৫৭৫।
২৫. ইমাম তাবরানী, হা. নং: ৯৯৪, খ. ১ম. পৃ. ২৯৮; ইমাম যাহাবী, মিযানুল ইতিদাল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৫ ইং, হা. নং ৪৫৯৫, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৯৩।
২৬. ইমাম সূয়ূতী, হুসনুল মাকছাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; ইমাম সুয়ুতী, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৮৮; ইমাম নাবহানী, হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, মাকাতাবাতু নূরিয়্যাহ রিজায়্যি, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, পৃ. ২৩৭।
২৭. ইমাম বুখারী, হা. নং: ৪৮১৩ ইমাম বায়হাকী, হা: নং: ১৩৭০১ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, আল-মুছান্নাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৪০৩ হি., হা. নং: ১৩৯৫৫, খ. ৭ম, পৃ. ৪৭৮।
২৮. ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯ম, পৃ. ১৪৫।
২৯. ইমাম কিরমানী, শরহু সহীহিল বুখারী।
৩০. ইমাম নাবহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭, ২৩৮; ইমাম সূয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত, ইমাম সূয়ূতী, হুসনুল মাক্বছাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; আল্লামা আলাভী মালেকী, হাওলুল ইহতিফাল বিযিকরিল মাওলিদিন নববী আশ-শরিফ, মাতবায়াতু দারি জাওয়ামিয়িল কালাম, কায়রো, মিশর, ১৪১৮ হি. পৃ. ১৭।
৩১. দেহলভী, শাইখ আব্দুল হক, মাদারিজুন নবুয়াত, মাতবায়ু মুনশি নওলাকছিরি, কানপুর, ভারত, খ. ২য়, পৃ. ১৯।

৩২. লাকনাভী, মাওলানা আব্দুল হাই, ফাতাওয়ায়ে আবদুল হাই, এইচ, এম সয়ীদ কোম্পানী, করাচি, খ. ২য়, পৃ. ২৮২।
৩৩. সালেহী, ইউসূফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ. ১ম পৃ. ৩২৭।
৩৪. মোল্লা, আলী কারী, আল মাওরিদুর রবী ফি মাওলিদিন নবি, আবেদীন মাকতাবাতিল কুরআন, কায়রো, মিশর, পৃ. ৫।
৩৫. হক্কী, আল্লামা ইসমাঈল, রুহুল বয়ান, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, খ. ৯ম, পৃ. ৪৭।
৩৬. দেহলভী, শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস, মা ছবাতা বিস্-সুন্নাহ ফি আইয়ামিন সানাহ, ইদারায়ে নয়ীমিয়্যাহ বিজবিয়্যাহ, লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ৬০।
৩৭. দেহলভী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস আদ্ দুররুছ ছমীন, পৃ.৮।
৩৮. দেহলভী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস, ফয়জুল হারামাইন, মুহাম্মদ সায়ীদ এডিশন্স, করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ৮০–৮১।
৩৯. মুফ্তি ইনায়াতুল্লাহ্, তাওয়ারিখি হাবীবে ইলাহ, মাকতাবায়ে মেহরিয়্যাহ রিজরিয়্যাহ, সিয়ালকুট, পাকিস্তান, পৃ.১৫।
৪০. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, শামায়িমে ইমদাদিয়্যাহ, মাদানী কুতুব খানা, লাহোর, ১৪০৫ হি., পৃ. ৯৫।
৪১. লাকনভী, আব্দুল হাই ফাতাওয়ায়ে আবদিল হাই, এস, এম, সায়ীদ কোম্পানী, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২য়, পৃ. ২৮৩।
৪২. আল ইলাম বিইলামি বায়তিল্লাহিল হারাম, পৃ. ১৯৬ এবং আল জামেউল লাতীফ ফি ফদলে মক্কা, পৃ. ২০১।
৪৩. মোল্লা আলী, আল মাওরিদুর রাভী ফি মাওলিদিন নবী পৃ. ১৫।
৪৪. ড. তাহের আল কাদেরী, মিলাদুন্নবী, আদবী দুনিয়া, দিল্লী, ভারত পৃ. ৫০৩।
৪৫. আল কাদেরী, মুহাম্মদ তাহের, মিলাদুন্নবী, পৃ. ৫০৯।
৪৬. বারকুক ইবন আনছ তাঁকে ইবন আনস আল উসমানী বলাও হয়। তাঁর উপাধি ছিল আল মালিক আয যাহের, তিনি মিসর ও সিরিয়া শাসন করেন।
৪৭. সাইফুদ্দিন আবূ সাঈদ জাকমুক, তিনি মিসর সিরিয়া ও হিজায শাসন করেছেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। [ইবন ইমাদ, শাযরাতুয যাহব, খ. ৭ম পৃ. ২৯১ এবং ড. তাহের আল কাদেরী, মিলাদুন্নবী, পৃ.৫০৭]।
৪৮. মুল্লা আলী কারী, আল মাওরিদুর রাভী ফি মাওলিদিন নবী, পৃ. ১৪।
৪৯. ইবন কাসীর, বিদায়া ওয়ান নিহায়, খ. ৯ম পৃ. ১৮।
৫০. মুল্লা আলী কারী, আল মাওরিদুর রাভী ফি মাওলিদিন নবী, পৃ. ১৫।
৫১. প্রাগুক্ত।
৫২. আল আলুজী, মুয়াল্লিফাতু ইবনুল জাওযী।
৫৩. ড. তাহের আল কাদেরী, মিলাদুন্নবী, পৃ. ৬৬২।
৫৪. দেহলভী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্, আদ দুররুস সামীন, পৃ. ৮।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি এবং তাঁর তাসাওউফ জীবনের পুণ্যছায়ায় সাহাবিগণ

ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

বিশ্বজগতের জন্য পরম সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল ও মানুষের প্রতি তৌহিদের বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়ে এই পৃথিবীতে মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর আগমন। তিনি স্বয়ং বিশ্বজগতের প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই সৌভাগ্যের কারণ। এ বিষয়টি মহান আল্লাহ্‌তায়ালা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, 'ওমা আরসাল না কা ইল্লা রহমাতাল্‌লিল 'আলামিন।' মহান আল্লাহ্‌র এই পবিত্র কালাম, মহানবী (দ.) এর আবির্ভাব দিবসে পৃথিবীর সর্বত্র ওলামা, মাশায়েখ, সুফি, শিক্ষক, সাধক নির্বিশেষে সবাই-বারংবার তিলওয়াত করেন। মহানবী (দ.) এর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। সর্বোপরি জগতের শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীর উম্মত হওয়ার জন্য সকৃতজ্ঞ উম্মতকুল মহান আল্লাহ্‌র দরবারে গভীর শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

রাসূল (দ.) মানুষের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার অফুরন্ত দয়া ও পবিত্র জীবনযাপনের দিগনির্দেশনাপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের সুস্পষ্ট আদেশ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁকে বলা হয়ে থাকে হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বন্ধু। কাজেই নবী (দ.) এর জীবনাদর্শ যারা অকুণ্ঠচিত্তে অনুসরণ করেন, তারা তাদের জীবনের আধ্যাত্মিক, ইহজাগতিক এবং পরজাগতিক জীবনে সাফল্যের অধিকারী হন। রাসূল (দ.) এর সাহচর্যপ্রাপ্ত এবং তাঁর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা পোষণকারী সাহাবিগণ তাই সকল বিবেচনায় গভীর শ্রদ্ধার দাবিদার। এটা তাঁদেরই জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যাঁরা মহানবী (দ.) এর সুউচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন, তাঁর তাসাওউফ সাধনা এবং মহান আল্লাহ্‌র করুণাসিক্ত মোজেজা সমূহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মহানবী (দ.) মহান আল্লাহ্‌র ঐশি ভালবাসায় তাঁর উম্মতকুল এবং সত্য অনুসন্ধানী মানুষের জন্য অসংখ্য আধ্যাত্মিক ও মহাজাগতিক ঘটনার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটি হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'পবিত্র কোরআনুল করিম। সেই সাথে পবিত্র মেরাজ, চন্দ্র বিদারণের ঘটনাবলীর মতো আরো ঘটনা পবিত্র সাহাবীগণ তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাসাওউফের মৌলিক উপাদানই হচ্ছে নিঃশর্ত আনুগত্য, স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আত্মসমর্পণ এবং ভালবাসা। পবিত্র সূরা ইখলাসের মর্মবাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ অভাবহীন, নিরংকুশ শক্তিধারী, কোন কিছুর মুখাপেক্ষিতাহীন এক মহাপবিত্র সত্তা। তাঁর পরিচয়প্রাপ্তির মধ্যে মানুষের আধ্যাত্মিক যোগ্যতার বিচার হয়। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) আল্লাহ্‌র মনোনীত ও প্রতিশ্রুত ইসলাম পরিপূর্ণকারী নবী হিসেবে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়ার পরিপূর্ণতাকে কার্যতঃ দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সত্তার স্বচ্ছতা,

আধ্যাত্মিক উচ্চতা এবং জাগতিক জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের পরিচর্যার সমন্বয় দেখে- আধুনিক যুগের গবেষকরা বিস্মিত হন। এই বিস্ময় আরো বেড়ে যায়, যখন দেখা যায় অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ সাহাবি, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ মহানবী (দ.) এর অধ্যাত্ম ও জাগতিক জীবনের পবিত্র আদর্শগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন।

এটি এমনই সত্য যে রাসূল (দ.) এর প্রতি গভীর প্রেম ছাড়া, কোনো বান্দার পক্ষে মহান আল্লাহ্তায়ালার ভালাবাসা অর্জন সম্ভব নয়। কারণ মহান আল্লাহ্ তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (দ.)কে ভালবাসেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা মহান আল্লাহ্কে ভালবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। (তাহলে) আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করবেন এবং আল্লাহ্তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়' (সূরা আল ইমরানঃ ৩১)।

উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে মহানবী (দ.) বলেন, 'যা আমি আদেশ করি তা মেনে চলো, যে সম্পর্কে আমি নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো'। তাফসিরবিদগণ বলেন, যারা এভাবে জীবনযাপন করবে তাদের জন্য উপরে উল্লেখিত আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে।

পবিত্র কোরআন, নবী (দ.)-এর জীবন এবং অলিআল্লাহ্গণের জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষকগণ উদ্ধৃত করেনঃ একদিন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-কে তাঁর একজন মুরিদ একটি খরবুজাহ ফল উপহার হিসেবে প্রদান করলেন। কিন্তু হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) এই বলে উপহারটি ফেরৎ দিলেন যে, 'প্রিয় নবী, রাসূল (দ.) এ ফলটি খেয়েছেন কী না, আর খেয়ে থাকলে কীভাবে খেয়েছিলেন তা আমি জানি না। এই উপহার গ্রহণ করলে এবং খেতে ইচ্ছুক হলে এর মাধ্যমে মহানবী (দ.) এর সুন্নতের উপর আমল করতে পারবো না। তাই এই উপহার আমি গ্রহণ করবো না।' এটি আর যাই হোক আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) প্রিয় নবী (দ.) এর প্রতি যে আনুগত্য ও ভালবাসা পোষণ করতেন তারই বহিঃপ্রকাশ। মহাকবি আল্লামা ইকবাল বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এভাবে, 'তুমি নিজেকে মহানবী মুহাম্মদ (দ.) এর মহান আদর্শের আলোকে গড়ে তোলো, কেননা এটাই হলো সঠিক দ্বীন ইসলাম। যদি তুমি তা করতে না পার তবে তোমার যাবতীয় কার্যক্রম আবু লাহাবের অনুসরণ হয় বলে বিবেচিত হবে'। [সূত্রঃ রাসূল (দ.) প্রেমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য/ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইফাবা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৫]

মহানবীর (দ.) অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ ও বেলায়তে মোত্লাকা

আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার জগতে জ্ঞানসাগর, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার রূহানি ভাষ্যকার, অছি-এ গাউসুল আযম এবং অলিআল্লাহ্, খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছদের সুন্নতে ওজমা অংশে মহানবী (দ.) এর অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি 'নবুয়ত ও

বেলায়তের স্বরূপ’ অনুচ্ছেদে লিখেছেন, সমস্ত সৃষ্টির মুক্তির তরণী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (দ.) এর প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে দু’টি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত হয়েছিল। এই দু’টির একটি নবুয়ত, অপরটি বেলায়ত। এ দু’টি নেয়ামত তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বন্ধুতে অভিষিক্ত করে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি মেরাজ মিলনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র মুক্ত দিদার লাভ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে নবুয়তের সমাপ্তি ঘটে। সৈয়দুল মোরসালিন, খাতামুন্ নাবিঈন হিসেবে তিনি নবুয়ত শেষ হওয়ার সনদ দাতা। বেলায়তি ক্ষমতায় তিনিই প্রথম আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের মুক্ত পথ আবিষ্কার করেন, যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সফল করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। এরই ফলশ্রুতিতে নবী, অলি, জ্বিন, মানব সবাই তাঁর উম্মত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মুহাম্মদ (দ.) এর প্রতি মহান আল্লাহ্‌তায়ালার এই যে নেয়ামত, তাকেই বলা হয়, ‘সুন্নতে ওজমা’। (বেলায়তে মোত্‌লাকা, বাংলা চলতি ভাষা রীতিতে সারানুবাদ, প্রথম পরিচ্ছেদ, মাসিক আলোকধারা, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৩)

বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের ‘নবুয়তে মোহাম্মদী (দ.)’ অনুচ্ছেদে বেলায়তের ধারাবাহিকতা, নবী করিম (দ.) এর বেলায়ত ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম স্তর সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ লিখেছেন জ্ঞানসাগর হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তা আবশ্যিকভাবে উদ্ধৃত করতে হয়। তিনি লিখেছেন, “নবী করিম (দ.) এর বাণী: ‘মহান আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে আমার এমন এক সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌র নিকটতম ফেরেশ্‌তা নবীয়ে মোরসালদেরও বা কিতাবপ্রাপ্ত অন্য নবীদেরও স্থান হয় না।” একথার অর্থ দাঁড়ায় এটা রাসূল (দ.) এর বেলায়তে ওজমার বিশেষ স্তর। এই স্তরে ফেরেশ্‌তা বা বিশেষ নবুয়তীগুণের নবীদেরও পৌঁছার সক্ষমতা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পবিত্র মেরাজ শরিফ, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সাথে নবী করিম (দ.) এর সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। এই ঘটনা অন্য নবীদের বেলায় ঘটে নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নবুয়তে ওজমা ও বেলায়তে ওজমা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (দ.) এর জীবন ও ব্যক্তিত্বে বিকশিত ছিল। যাকে বেলায়ত বলা হয়, তা একটি চিরকালিন সত্য, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (দ.) এর এই পার্থিব জগৎ ত্যাগের পর অলীয়ে কামেলদের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত থাকে। সেই সাথে সব ধরনের বেলায়ত, বিশেষ করে বেলায়ত বিল অরাসত ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রা.) এর জীবন ও ব্যক্তিত্বে কেন্দ্রীভূত হয়। হুজুরে আকরাম (দ.) বলেছেন: ‘আমি যার মাওলা (প্রেমাস্পদ হই) আলী (রা.) তার মাওলা’। ‘আমি এরকম (দু’টি মহান) বস্তু তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি যা তোমরা আঁকড়ে ধরলে আমার (তিরোধানের) পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (প্রথম) তোমাদের হাতে কিতাবুল্লাহ্ বা কোরআনপাক এবং (দ্বিতীয়) আমার আহলে বাইত [রাসূল করিম (দ.), হযরত আলী (রা.), হযরত মা ফাতেমা (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত হোসাইন (রা.) এবং তাঁদের বংশধরগণ]’ (তিরমিজি, মিশকাত)।

ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর জন্য নিজের দেহ ও প্রাণ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ভালবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হিযরতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর বিছানায় মহানবীর চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি যা নবুয়তে সুপ্ত ছিলো, তা হযরত আলী (রা.) এর জাতে পাকে (পবিত্র সত্তায়) প্রস্ফুটিত হলো। ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রা.) এর বাণীতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'আমি মহাপ্রতাপশালীর নিয়ন্ত্রণে রাজি হয়েছি, আমার ভাগে ইলম বা জ্ঞান এবং আমার বিপক্ষের ভাগে ধন ঐশ্বর্য পড়েছে, হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে রসূলে করিম (দ.) এর অনন্ত গৌরবময় বেলায়তী অভিযানের দরজা উন্মুক্ত হলো।

পবিত্র হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, "আমি ইলমের শহর বা হেকমতের ঘর এবং আলী এর দরজা। (বেলায়তে মোত্লাকা, বাংলা চলতি ভাষা রীতিতে সারানুবাদ, প্রথম পরিচ্ছেদ, মাসিক আলোকধারা, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৯)

বেলায়তের উত্তুঙ্গ শিখরে মহান আল্লাহ্র অশেষ করুণায় আসীন রাসূল (দ.) এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছিলো। সাহাবিগণ রাসূল (দ.) এর এই সব গুণাবলীতে অভিভূত ছিলেন। মহানবী (দ.) এর ক্ষমা, ঔদার্য, বিনয়, দৃশ্য-অদৃশ্য জগতের জ্ঞানে তাঁর ঋদ্ধতা নিয়ে সাহাবিগণের অসংখ্য বর্ণনা ও দলিল রয়েছে। এসব কিছু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞান পিপাসু, সত্য অনুসন্ধানী গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

বাঙ্গালী বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মহানবী রাসূল (দ.)-কে জগতের আদর্শ মহামানব আখ্যায়িত করেছেন। একদিকে পার্থিব জগৎ সংসারে আল্লাহ্র একত্ববাদ, আল্লাহ্র নির্দেশিত মানবিকতা ও ইসলামের শান্তি প্রচারের কঠোর সংগ্রাম, অন্যদিকে বিশ্ব-প্রতিপালকের রহস্যময় তাসাওউফের জগতে বেলায়তের জ্যোতির্ময় সম্পর্ক– এই কঠিন ভারসাম্য রক্ষায় মহানবী মুহাম্মদ (দ.) সত্যিই অতুলনীয়। সাহিত্যিকরা বাকরুদ্ধ ও শব্দরহিত হয়ে যান। মহান আল্লাহ্র আরশের পবিত্র নিস্তব্ধতায় যে ঐশি ভাষা ও পবিত্র বাণী প্রবহমান– তা মহানবী (দ.) ছাড়া আর কারো পক্ষে শ্রবণ-অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তথাপি নবী মোহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, "জগতে অনেক মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব এক এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কিন্তু মহত্তের সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করেছেন কেবল একজন। তিনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। এটা আমি ভক্তির উচ্ছ্বাসে বলছি না। একজন ফরাসী লেখক আলফ্রেড দে-লামার্টিন তাঁর তুর্কীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলেছেন– 'দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম-প্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম-পদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহাম্মদ (সা.)। মানুষের মহত্তের যতগুলি মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তাঁর চেয়ে

মহৎ হতে পারে?” [জগতের আদর্শ মানব/ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইফা প্রকাশনা, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), সম্পাদক: মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, প্রথম সংস্করণ ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ১২]

নবী করিম (দ.) সবার সামনে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যে, বিনয়, নম্রতা ও ঔদার্য ছাড়া আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কাজেই তাঁর এসব গুণাবলী সাহাবাগণ বহু দিক থেকে বহুভাবে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এমন কিছু বিষয় সাহাবাগণের বক্তব্য থেকে তুলে ধরা যায়। হযরত আলী (রা.) রাসূল (দ.) এর মহত্ত্ব সম্পর্কে বলেন, হুজুর (দ.) সর্বাধিক প্রসন্ন অন্তরের অধিকারী ছিলেন। সামাজিক জীবনে এবং লেনদেনে তিনি অত্যন্ত উদার ও মহান ছিলেন।

“হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী (দ.) এর কাছে কেউ কোনদিন এমন কোন বস্তু প্রার্থনা করে নি, যা তিনি তাকে প্রদান করেন নি।”

ইমাম তিরমিজী (রহ.) বর্ণনা করেন: একবার প্রিয়নবী (দ.) এর দরবারে নব্বই হাজার দিরহাম পেশ করা হলো। প্রিয়নবী (দ.) তা খেজুর পাতার তৈরি একটি মাদুরের উপর রেখে প্রার্থীদেরকে দান করতে আরম্ভ করলেন। ঐ সমুদয় অর্থ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রিয়নবী (দ.) কোন প্রার্থীকেই বিমুখ করেন নি। সবশেষে একব্যক্তি উপস্থিত হয়ে সাহায্য চাইলেন। রাসূল (দ.) বললেন এখন তো তোমাকে দান করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে তুমি আমার নামে কোন কিছু ক্রয় করে নাও, যখন আমার কাছে অর্থ আসবে তখন আমি তা পরিশোধ করবো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন: কুমারী মেয়েরা পর্দার মধ্যে যেমন লাজুক থাকে, প্রিয়নবী (দ.) তাদের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। প্রিয়নবী (দ.) এর দেহ মোবারক ও চর্ম অত্যন্ত নরম-মসৃণ ছিল। তিনি কাউকে তার সামনে কষ্টদায়ক কথা বলতেন না।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (দ.) স্বভাবগতভাবেও কাউকে কঠিন কথা বলতেন না এবং স্বেচ্ছায়ও কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। মর্যাদার পরিপন্থী এবং অহেতুক কোন কথা তিনি বলতেন না, কোন মন্দের বিনিময়েও তিনি মন্দ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন: প্রিয়নবী (দ.) অধিক লাজুকতার কারণে কারও চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারতেন না, অর্থাৎ কারো মুখাবয়বের উপর চোখাচোখি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারতেন না। কোন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা যদি একান্তই করতে হতো, তাহলে তা ইশারা ইঙ্গিতে করতেন।’ (সূত্র: ইফা প্রকাশনা, ক্ষমা ও ঔদার্য/ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম)

গবেষকরা মনে করেন পবিত্র অন্তর ও বিনয়ী সত্তার কারণেই মহান আল্লাহ্তায়ালা রাসূল (দ.)-কে পবিত্র মেরাজের মতো ঘটনায় তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে বিরল সম্মানে ভূষিত করেছেন। পবিত্র কোরআনুল করিমে মহান আল্লাহ্ বলছেন, 'পবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার চতুর্দিক আমি বরকতময় করেছিলাম, যাতে করে আমি তাকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাই, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'

আখেরি নবী সৈয়দুল মোরসালিন, রহমাতাল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (দ.) মহান আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে একজন প্রতিশ্রুত নবী। তিনি এসে পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন বলে মহানবী (দ.) আগমনের বহুপূর্ব থেকে বহু ধর্মগ্রন্থে তাঁর আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাসাওউফের দৃষ্টিতে এই প্রতিশ্রুতিই স্বাভাবিক। যাঁর উপলক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তার অধ্যাত্ম-পরিসীমা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সবচেয়ে আদি ও অনন্য রূপ এতে কোনো সন্দেহ নেই। হযরত আদম (আ.) এবং বিবি হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার পর অনুশোচনায় শতশত বছর মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু একদিন তাঁদের স্মৃতিপটে জেগে উঠল পবিত্র পাক-পাঞ্জাতনের কথা। বেহেশ্‌তের শীর্ষে পবিত্র আলোর জ্যোতিতে লেখা হযরত মুহাম্মদ আহমদ (দ.) ও আহলে বাইতের নাম। এই পবিত্র নামের উসিলাতেই মানুষের আদি পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা পেয়েছিলেন। অনুরূপ আজ প্রতিটি নামায ও প্রার্থনা দরূদ পাঠ ছাড়া অপূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহ্‌র কাছে অগ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত। মহাজাগতিক অধ্যাত্ম পরিসীমা বিচারে মহানবী (দ.) এর পৃথিবীতে আগমনের বহু পূর্বে অন্যান্য ধর্মে কী বলা হয়েছিলো এ প্রসঙ্গে ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ তাঁর 'তমসার বুকে চাঁদের উদয়' লেখায় উল্লেখ করেন: 'শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থাদিতেই নয়, আমাদের মহানবী (দ.) যে আল্লাহ্‌র সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর তার উল্লেখ রয়েছে হিন্দুদের বেদ-পুরান ও উপনিষদে, বৌদ্ধদের প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ 'দিঘানিকায়ায়', উল্লেখ রয়েছে পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ 'জিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'-এ; কোথাও মহমদ, মহামদ, কোথাও মৈত্তেয় বা শান্তি ও করুণার বুদ্ধ নামে, এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে– তিনি আসবেন, পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত তিনি, তিনি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন।"

মহানবী (দ.) এর সারাজীবনে প্রধান-অপ্রধান মিলে সাহাবার সংখ্যা নিয়ে গবেষকদের নানা ধরনের যুক্তি ব্যাখ্যা আছে। বহু ঘনিষ্ঠ সাহাবা মহানবী (দ.) এর কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতার ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন হযরত আলী (রা.) মধ্য দিয়ে। এ কথাতো পবিত্র মুখে বলাই হয়েছে, নবুয়ত রাসূল (দ.) এর মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে। তা না হলে হযরত মুসা (আ.) এর সাথে যেমনি হযরত হারুন (আ.) নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন, মর্যাদার দিক থেকে রাসূল (দ.) এর সাথে হযরত আলী (রা.) তাই হতেন। শুধু নিকটাত্মীয় নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবা হিসেবে এটি আলী (রা.) এর একটি পরিমাপহীন মর্যাদার কথা।

তাসাওউফের জ্যোতি ও মহানবী (দ.)

মহানবী (দ.) মহান আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় বন্ধু হিসেবে মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের যে দিগনির্দেশনা দিয়েছেন, তা মহান আল্লাহ্‌তায়ালা থেকেই প্রাপ্ত। জাগতিক ও মানবিক জগতের শৃংখলার জন্য মহানবী (দ.) এর প্রকাশ্য সংগ্রাম, আদেশ, নির্দেশ, জীবন যাপন কর্মপ্রক্রিয়ার ভেতরে তাসাওউফের যে পবিত্র সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী আলো বিচ্ছুরিত হয় তা পবিত্র রূহ্‌ানী শক্তিহীন মানুষের পক্ষে অবলোকন অনুধাবন সম্ভব নয়। এটা মন খারাপ করার মতো সত্য যে নবী (দ.) এর তাসাওউফের জ্যোতিঃ দেখার সামর্থ্য অধিকাংশ মানুষের হয় না। তবে মহান আধ্যাত্মিক জনদের সান্নিধ্যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এই তাসাওউফ আলোতে বিমুগ্ধ হন। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই আলোতেই তাদের নিরাপত্তা ও দেহমনের শক্তি সূচিত হয়। সমগ্র বিশ্বজুড়ে মানুষের কষ্ট, ধ্বংস, আহাজারি, বিক্ষুব্ধতা, অশান্তির অন্যতম কারণ এই তাসাওউফের আলো থেকে বঞ্চিত থাকা। শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব মহানবী (দ.) এর উম্মতদের একবিংশ শতাব্দীতে এতো অধঃপতন ও ধ্বংসের অতলে নিয়ে গেছে যে, মৌলিক কারণ বিশ্লেষণে এই সত্যই দাঁড়ায় যে, মোহাম্মদ (দ.) থেকে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত হিসেবে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সৌরভ তারা অন্বেষণের চেষ্টা করেন নি। অতীত ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে তাসাওউফের পবিত্র আলোকশিখা জ্বালাতে গিয়ে বহু অলি-আল্লাহ্ নির্যাতিত হয়েছেন। কখনও শাসকদের হাতে কখনও বা নির্বোধ সাধারণ মানুষের হাতে।

কিন্তু তারপরও মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সৃষ্ট এই মানবিক জগতে পৃথিবী ও মহাসৃষ্টিকে পরিচালনার জন্য তাঁরই একক স্রষ্টাশক্তি থেকে মহানবী (দ.) এর মাধ্যমে খতমে নবুওতের পর তাসাওউফের ধারা বহমান রেখেছেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার রূহ্‌ানী ভাষ্যকার, মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও বেলায়তের স্বরূপ লিখিত গ্রন্থাকারে প্রকাশকারী অছিয়ে গাউসুল আযম, সুলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই বিষয়টি তাঁর বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রামাণ্য সহযোগে সেটির সুবিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেছেন।

আধুনিক জগতে ও সময়ে বেলায়তে মোত্‌লাকার আলোকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বহমান তাসাওউফসিক্ত সত্যকে অনুধাবন করার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় রাহবারে আলম হযরত শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) (মওলা হুজুর)। আমাদের জীবন-বোধ, জ্ঞান জাগতিকতা কতোটা আপডেইট বা হালনাগাদ করে অন্ততঃ মানুষ হিসেবে সবাই উপযুক্ত হয়েছি আত্মজিজ্ঞাসার এই জরুরী প্রসঙ্গটি তিনি নির্দেশ করছেন।

খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের বেলায়তে ওজমা বা কুবরা স্তর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'গাউসিয়ত বা ত্রাণকর্তৃত্বে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন অলিকে গাউসুল আযম বলা হয়। পাশাপাশি

কুতুবিয়ত বা কর্মকর্তৃত্বে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদায় উঠে আসা অলিকে কুতুবুল আকতাব বলা হয়। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশে সৃষ্টি জগতের শৃংখলা বিধানের সর্বময় কর্মকর্তারূপে বিরাজমান থাকেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর রয়েছে দু'টি নাম, একটি আহমদ এবং অপরটি মোহাম্মদ। আহমদ সৃষ্টির আদিতে গোপন, সূক্ষ্ম জগতে সৃষ্টি রহস্যের মূল আধাররূপে বিরাজ করছিলেন। মোহাম্মদ (দ.) এই বিশ্বজগতে মঙ্গলময় ত্রাণকর্তা হিসেবে বিকাশ লাভ করেন। এই পবিত্র নাম দু'টির প্রভাবে সমস্ত নবী এবং অলি, আহমদী ও মোহাম্মদী এই দু'টি মসরবে ভাগ হয়েছেন। গাউসিয়তের উৎস হচ্ছে মোহাম্মদীয়ুল মসরব এবং কুতুবিয়তের উৎস হচ্ছে আহমদীয়ুল মসরব।' (মাসিক আলোকধারা, বাংলা চলতি ভাষা রীতিতে সারানুবাদ, বেলায়তে মোত্‌লাকা, সুন্নতে ওজমা, প্রথম পরিচ্ছেদ, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৪,৫)

উপরোক্ত বিষয়টি এজন্য উদ্ধৃত হলো যে, মহানবী (দ.) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে (দশম হিজরিতে) জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্ব পালন করতে গিয়ে জাবাল উল আরাফাতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সাহাবা কেরাম সহ উপস্থিত বিশাল জনসমুদ্রে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা যথাযথভাবে অনুধাবনে মুসলিম সমাজ কতোটুকু সমর্থ হয়েছে এই প্রশ্ন এখন উঠছে। বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী (দ.) শুধু কেবল জাগতিক ও ব্যবহারিক জীবনের দিগনির্দেশনা দেন নি, উপরন্তু তাতে ছিলো প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক দিগনির্দেশনাও। আল্লাহ্‌ প্রেম, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি প্রেম, জীবনের শৃংখলা, মূল্যবোধ, মানবতা, সাম্য, সামাজিক আইন সহ যাবতীয় বিষয় এ ভাষণে বিধৃত করেছেন নবী করিম (দ.)।

তাসাওউফের গভীর যে উদ্দেশ্য তা হলো আল্লাহ্‌তায়ালার একত্ব, তাঁর প্রতি বান্দার বন্দেগি, ভালবাসা, মানবতা। এ কারণে লেখক গবেষকগণ বলেন, বিদায় হজ্বের মাধ্যমে মহানবী (দ.) কোনো জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করে যান নি। প্রতিষ্ঠা করেছেন ভ্রাতৃত্ব। আর সে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ মানবতা। তৌহিদ, আল্লাহ্‌র রবুবিয়ত এবং সাধারণ মানুষের মানবীয় উৎপত্তিগত প্রকৃতির বুনিয়াদেই গড়ে উঠেছে এ আদর্শ। সুতরাং ইসলামী নীতি অনুসারে মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের এ আদর্শ বর্ণ, জাতি, শ্রেণী, ভাষা ও পরিবারের সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করে গেছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে মানবতা। (বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ: বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ/ মো: শফিকুল ইসলাম, সংকলনগ্রন্থ, ইফা প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, ঢাকা)

গবেষকগণ বিদায় হজ্বের ভাষণে যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে মানবজাতির ঐক্য ও আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব। যার মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্য হিসেবে রয়েছে হক্কুল্লাহ এবং হককুল ইবাদ। এ বিষয়টি তাসাওউফের আলোকদর্শন ছাড়া প্রচলিত কোনো সামাজিক ও জাগতিক নীতিতে পুরোপুরি অনুধাবন সম্ভব নয়। মহাকবি শেখ সাদী (রহ.) বিষয়টির ইঙ্গিত দেন তাঁর একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতারটির ফার্সি মূল: 'বনি আদম 'আযা-ই-য়ক দিগর বন্দ,/কে দর আফ্রীনম যে য়ক জওহরন্দ, / চুঁ উযুএ ব-দর্দ আওরদ বোযগার,/ দিগর

উযুহারা অ-মামদ করার। /তু ক মিনহত-ই-দিগারাঁ বে-গয্মী।/ ন-শায়দ নামও নিহন্দ আদমী।'

কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে: 'মানব সন্তান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সমান, / একই বস্তু তাদের হয় উপাদান।/ কালক্রমে এক অঙ্গে যদি হয় ব্যথা, / সকল অঙ্গেতে হয় ঘোর অস্থিরতা।/ তুমি যদি পর-দুঃখে না হও দুঃখিত, / মানব তোমার না হওয়াই উচিত।'
এভাবে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (দ.) এর আধ্যাত্মিক দিগনির্দেশনা যে কতো গভীর তা বুঝা যায় তাঁর পবিত্র ভাষণে, 'সাবধান! ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে না। কেননা ধর্মের সঠিক বন্ধনসমূহ অতিক্রম করার ফলে তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

মানব মনের বিভ্রান্তি, জাগতিক লোভ লালসা, দুষ্টবুদ্ধি, অনিষ্টতা, ভোগবিলাস ইত্যাদি নেতিবাচকতা যে শয়তানি (ডেভিল) প্ররোচনা, আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার অন্তরায় তাও বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (দ.) স্পষ্ট করে বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, "হে জনতা! নিশ্চয় তোমাদের কাছ থেকে শয়তান উপাসনা না পাবার কারণে তোমাদের পেছনে হতাশ হয়ে লেগেছে। আল্লাহ্‌র প্রতি প্রার্থনা নয়; বরং অন্য কিছুর প্রতি আনুগত্যে সে সন্তুষ্ট হবে, আর ঐসব বিষয় যা তোমরা তুচ্ছ বলে মনে কর। সুতরাং ধর্মের ব্যাপারে শয়তান সম্বন্ধে (ডেভিল, স্যাটার্ন) সাবধান হয়ে যাও।"

উপরোক্ত ভাষণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে মানুষের আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার প্রতিকূলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। যা কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়, তার ব্যাখ্যা ও অনুধাবন তাসাওউফের পবিত্র আলোতে আরো বিশদীকরণ সম্ভব। ব্যাখ্যাযোগ্য উপলব্ধিকে ছাড়িয়ে ব্যাখ্যাতীত এবং কেবল হৃদয়ঙ্গম ক্ষমতায় আমাদের মন বুঝতে পারে শয়তান থেকে সৃষ্ট প্রলুব্ধকর ক্ষতির বিষয়গুলো। মহানবী (দ.) আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাঁর ভাষণে এই যে বিষয়টি তাঁর পবিত্র মুখের ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন, এই বিষয়টি আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতি বিবেচনায় ব্যাপক গবেষণা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। মানুষ সভ্যতার এতো অগ্রগতি সাধনসত্ত্বেও আজও কেনো রক্তপাত, হানাহানি, পরস্ব হরণ, আগ্রাসন, নীতিগত বিরোধসহ অসংখ্য মধ্যযুগীয় অমানবিকতায় লিপ্ত তা কী সাধারণ মনে বুঝা যাবে? বিদায় হজ্জে মহানবী (দ.) মানবমুক্তির জন্য তাঁর ভাষণে যে মহাবাণী দিয়ে গেছেন- তা থেকে শিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়াটি কী হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। শয়তানের স্বরূপ কী তারও একটি আধুনিক ব্যাখ্যা ও তার অসংখ্য ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন।

মহানবী (দ.) এর মর্যাদার ঐশি রূপ

সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর মহান খোদাতায়ালার অসীম করুণা স্বরূপ মহানবী (দ.) সম্পর্কে সাহাবা কেরাম নানাভাবে অবগত হয়েছেন। সাহাবা কেরাম নানা প্রশ্নে, নানা জিজ্ঞাসায় অবহিত হয়েছেন। বিস্ময়কর ও মানবকুলের কল্পনাতীত অনেক ঐশি তথ্য সম্ভারের। মহানবী

মোহাম্মদ (দ.) নিজেই বলেছেন, 'আমি রাসূলগণের ভূমিকা, আমি নবীদের উপসংহার।' তাঁর এই পবিত্র বাণী প্রমাণ করে দেয় মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রহমাতাল্লিল আলামিন মহানবী (দ.) সমস্ত বিশ্বজগতেরই আধ্যাত্মিক নেতা। তাঁর প্রতি প্রেম, তাঁকে অনুসরণের মধ্যেই নিহিত সৃষ্টি জগতের মুক্তি।

হাদিসে কুদসি থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ্‌তায়ালা ছিলেন এক গুপ্ত ধন। তিনি আপন মহিমা-গরিমায় মহিমান্বিত অবস্থায় বর্তমান ছিলেন। তিনি আপন কুদরতের মহিমা বিকশিত করার লক্ষ্যে তাঁর খালিক সিফাতকে প্রকাশ করার জন্য এক স্বচ্ছ-সমুজ্জ্বল নূরের উন্মেষ ঘটান। সেই পবিত্র নূর অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি জগতের সূচনা হয়। সেই পবিত্র নূর থেকে একে একে সৃষ্টিজগতের নতুন নতুন সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। এই নূরে মুহাম্মদিই হচ্ছেন প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর নূর মুবারক। মহানবী (দ.) এর পবিত্র নূর সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন বিশ্বজগত সৃষ্টির সূচনা হয়েছে তেমনি মহান আল্লাহ্‌ তাঁকে নবুয়ত দান করে নবুয়তেরও সূচনা করেছেন। পৃথিবীতে তাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই নবী আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটে। (সূত্রঃ নবূয়তে মুহাম্মদীর সার্বজনীনতা/ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, সংকলন গ্রন্থ, ইফা প্রকাশনা, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ২৭১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, একবার সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী (দ.)কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি নবুয়ত লাভ করেন কোন সময়? তিনি বললেনঃ যখন আদম রূহ্‌ ও দেহের মাঝখানে।

এই হাদিসের আলোকেই গবেষকরা স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে অনুধাবন করেন, মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর দেহে প্রাণের স্পন্দন আসারও বহু আগে মহান আল্লাহ্‌ রাসূল (দ.)-কে নবুয়ত দান করেন। একজন সাহাবী মহানবী (দ.)-কে প্রশ্ন করলেন, এই বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.)! আপনাকে কখন নবী করা হয়েছে? উত্তরে প্রিয় নবী (দ.) বললেনঃ আমার কাছ থেকে যখন নবুয়তের অঙ্গীকার (মীসাক) গ্রহণ করা হয়, তখন আদম রূহ্‌ ও দেহের মাঝখানে ছিলেন।

বিশিষ্ট লেখক, চিন্তাবিদ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম এ প্রসঙ্গে এখানে বর্ণনা করেন, এই মীসাকের মধ্য দিয়ে নবুয়তে মুহাম্মদীর বিশ্বজনীনতার উন্মেষ ঘটে, যার অব্যাহত প্রভাব মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে বর্তমান। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা রূহের জগতে বা ঊর্ধ্ব জগতে সমস্ত নবী-রাসূলের রূহ্‌কে সমবেত করে তাঁদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (দ.)-কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করবার এবং তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করবার। পবিত্র কোরআন শরিফে মহান আল্লাহ্‌ বলছেনঃ তোমাদেরকে প্রদত্ত কিতাব ও হিকমতের শপথ আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবেন, তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি

বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম। (সূরা আল ইমরান: ৮১)

এই সব অকাট্য দলিল ও প্রামাণ্যে একথাই এখন স্পষ্ট পবিত্র রূহ্‌ানি শক্তির আলোকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে মহানবী (দ.) সমগ্র সৃষ্টি ও মানবজাতির পথপ্রদর্শক। তাঁর বিশেষত্ব তিনি বিশ্বজনীন, তিনি সর্বজনীন। মানুষ তার জীবনের সাফল্য লাভ করতে তাঁর থেকেই নিয়ে থাকেন ফয়েজ বরকত ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ। এটা মহান আল্লাহ্‌রই অভিপ্রায়। আমরা আমাদের সম্মানিত সাহাবা কেরামের যতো গুণাবলী, মানবিক সামাজিক সৌন্দর্যময় কর্মকাণ্ড দেখি– তা মূলতঃ মহানবী (দ.) থেকে প্রাপ্ত পবিত্র শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ। পরম অধ্যাত্মবার্তা এই, মহানবী (দ.) এর দরূদ ছাড়া মহান আল্লাহ্‌র কাছে কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মহান অধ্যাত্মনেতা রাসূল (দ.) এর শানে লিখেছেন তাঁর সেই গান:

‘আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়, ও গো হৃদয়ে যার রয়,
খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয়।’

লেখক: কবি, লেখক, গবেষক ও সম্পাদক, মাসিক আলোকধারা।

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাওলানা হাফেজ আবুল কালাম

ঈদ শব্দের আভিধানিক অর্থ খুশি, আনন্দ, আহ্লাদ বা সেই দিবস যা স্মরণীয় ব্যক্তির শুভাগমন বা স্মরণীয় ঘটনাজনিত কারণে উদযাপিত হয় ইত্যাদি। অভিধান পর্যালোচনা করলে 'মিলাদ' শব্দের– 'মিলাদ', 'মাওলেদ' ও 'মৌলুদ' তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। 'ছোরাহ' নামক অভিধান অনুসারে মিলাদ অর্থ জন্মস্থান আর মাওলেদ অর্থ জন্মকাল। 'গেয়াছুল লোগাত' নামক অভিধানে মিলাদ অর্থ জন্মকাল, 'ফরহাঙ্গে রব্বানী'তে মিলাদ অর্থ জন্মদিন, আর মাওলেদ অর্থ শিশু লিখা হয়েছে। আর 'মিলাদুন্নবী' মানে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর পবিত্র জন্মদিন লিখা হয়। তা ছাড়া 'লেছানুল আরব', 'তাজুল উরূস', 'মোহকাম', 'আদাস', 'তাহজীব' ও 'ছেহায়ে জাওহারী' ইত্যাদি প্রখ্যাত অভিধান সমূহেও উল্লেখ আছে যে, মাওলুদ হল জন্মস্থান ও জন্মকাল, আর মিলাদ অর্থ জন্মকাল ও জন্মদিন। সুতরাং 'মিলাদুন্নবী', 'মাওলেদুন্নবী' ও 'মাওলুদুন্নবী' (দ.) এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্মদিন ও জন্ম কাহিনী এবং তৎ সম্পর্কীয় ঘটনাবলীর আলোচনা। আর 'ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)' হলো আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর পবিত্র জন্মদিনের খুশি উদ্‌যাপন এবং এতদুপলক্ষে মাহফিল ও আলোকসজ্জা, তাঁর পবিত্র জীবনী আলোচনা, তাঁর উসওয়াতুন হাসানাহ বা মহান আদর্শ প্রতিফলনের প্রচেষ্টা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ও আয়োজন।

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর আগমনে খুশি বা ঈদ উদ্‌যাপন করা: পবিত্র কুরআনের আলোকে

১. অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে খুশি উদ্‌যাপন

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "হে প্রিয় হাবীব (দ.)! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ, তা তাদের সমস্ত ধন দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়- (সূরা ইউনুস : ৫৮)
অর্থাৎ হে প্রিয় হাবীব (দ.) আপনি বলুন, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্ত হও, তখন তোমরা খুশি উদ্‌যাপন করো, তোমাদের জীবনের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির যত সঞ্চয় আছে তার চেয়ে উত্তম হবে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.)'র শুভাগমনে খুশি উদ্‌যাপন করা।

২. আর তারা এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানদের উপর যে তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং

তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। আর তারা এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো (সূরা আল ইমরান : ১৬৪)।

আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর শুভাগমনকে মুমিনদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে তা নিয়ে খুশি উদ্‌যাপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পার্থিব সাধারণ নেয়ামত বা অনুগ্রহ লাভ করার দরূন যদি ঈদ বা খুশি প্রকাশ করা যেতে পারে তবে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ, অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) মহান রাসুলের শুভাগমনের মুহূর্তে মাস-দিন ও কালকে স্মরণ করে (শরিয়ত সম্মত উপায়ে) আনন্দোৎসব করা যে উত্তম কাজ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৩. তোমাদের কষ্ট তাঁর নিকট কষ্টদায়ক

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরিফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই রাসূল (দ.) যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া বড়ই কষ্টদায়ক। তোমাদের কল্যাণ অতি মাত্রায় কামনাকারী মুসলমানদের জন্য অতি দরিদ্র দয়ালু (সূরা তাওবা : ১২৮)।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মক্কাবাসী তথা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে তাঁর প্রিয় হাবীর (দ.) এ ধরার বুকে শুভাগমন করা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর গুণাবলী ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.)কে এ সব অবস্থা ও গুণাবলী সহকারে জগতে প্রেরণ করা আমাদের জন্য আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত বা সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সায়্যিদেনা ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.)কে আপন দু'টি নাম 'রউফ' (দয়ার্দ্র) ও রাহিম (দয়ালু) দ্বারা আখ্যায়িত করে অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন (তাফসিরে কবির, ৮খণ্ড, ২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠা)।

৪. মহান আল্লাহ্ মানব জাতির প্রতি উজ্জ্বল আলো অবতীর্ণ করেছেন

ঐশী প্রত্যাদেশ– "হে মানবকুল! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলো অবতীর্ণ করেছি (সূরা নিসা : ১৭৪)।

এ আয়াতে 'বোরহান' শব্দের তাফসির প্রসঙ্গে তাফসিরে কবির, তাফসিরে রুহুল বয়ান ও তাফসিরে জালালাঈন-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) হলেন আল্লাহ্র নিকট থেকে তোমাদের নিকট 'বোরহান' তথা অকাট্য প্রমাণ। এখানে 'বোরহান' মানে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (স.)। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন– উক্ত আয়াতে প্রিয় রাসূলকে (দ.) 'বোরহান' বলা হয়েছে, যেহেতু তাঁর বরকতময় কাজ হচ্ছে হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং বাতিল ও অন্যায়কে খণ্ডন করার জন্য অকাট্য প্রমাণ পেশ করা (তাফসিরে কবির, তাফসিরে জালালাইন-এর হাশিয়া সূরা নিসা ৯৩ পৃষ্ঠা)।

৫. মহান নূর-এর আগমন

মহান আল্লাহ্র বাণী– "নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মহান নূর এসেছে এবং এসেছে স্পষ্ট কিতাব (সূরা মায়েদা : ১৫)।

তাফসিরে কবির, তাফসিরে জালালাঈন, তাফসিরে রুহুল মা'আনী, তাফসিরে রুহুল বায়ান সহ সকল নির্ভরযোগ্য তাফসিরের ব্যাখ্যা মতে এ আয়াতে বর্ণিত 'নূর' ও 'বোরহান' দ্বারা আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.)কে বুঝানো হয়েছে। এসব আয়াতে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর শুভাগমন অর্থাৎ তাঁর বরকতময় জন্ম (মিলাদ শরিফ) এর বিবরণ পাওয়া যায়।

৬. সকলের জন্য ঈদ

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) আরয করলেন, হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা খাদ্য খাঞ্চা অবতরণ করুন যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দোৎসব) হবে। আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য এবং আপনারই নিদর্শন হবে। আমাদেরকে রিযিক দান করুন আর আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিক দাতা (সূরা মায়েদা : ১১৪)।

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে খাঞ্চা ভরা খাদ্য আসলে তা যদি হযরত ঈসা (আ.) এর ভাষায় পূর্ব ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ উৎসবের কারণ ও আল্লাহ্র নিদর্শন হয়, তাহলে সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সত্তা রহমতের ভাণ্ডার আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মত মহান নিয়ামতের শুভাগমনের দিন ও মাস কতই মর্যাদাবান, গুরুত্ববহ আনন্দের দিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর শুভাগমনের পূর্বে তোমরা দোযখের প্রান্তে ছিলে

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "এবং আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর সবাই মিলে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা এবং নিজেদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো; তিনি তোমাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহক্রমে তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছো এবং দোযখের একটা গর্তের প্রান্তে ছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ পাক তোমাদের নিকট এভাবেই স্বীয় নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হিদায়ত পাও (সূরা আল ইমরান : ১০৩)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বায়দ্বাভী (রহ.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, আউস ও খারাজ উভয়ে বৈমাত্রেয় ভাই সম্পর্কীয় গোত্র ছিল। তাদের উভয়ের সন্তানদের মধ্যে শত্রুতা বিরাজ করছিল এবং দীর্ঘ একশ বিশ বছর যাবৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। আল্লাহ্ তাদের মধ্যকার শত্রুতা ও যুদ্ধের আগুন ইসলামের মাধ্যমে নিভিয়ে দিলেন এবং তাদের মধ্যে তাঁর রাসূল (দ.) এর মাধ্যমে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিলেন – (তাফসিরে বায়দ্বভী, সূরা আল ইমরান, ৮৪ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে জরীর তাবারী (রহ.) ও ইবনে আবি হাতিম, ইমাম সুদ্দী থেকে আল্লাহ্‌র বাণী "তোমরা দোযখের গর্তের তীরে ছিলে"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা দোযখের কিনারায় উপনীত হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ (কুফরী অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করলে সে দোযখের আগুনে পতিত হতো। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তার প্রিয় হাবীব (দ.)কে প্রেরণ করলেন। আর তোমাদেরকে ওই গহ্বর থেকে রক্ষা করলেন (জামিউল বায়ান, ১ম খণ্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতে পাকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদ বা পৃথিবীর বুকে শুভাগমনের মাধ্যমে আরববাসী তথা পৃথিবীবাসীদেরকে জাহান্নামের অতল গহ্বর থেকে পরিত্রাণ দানের কথা সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনে 'নিয়ামাতুল্লাহ্' এর তফসির করতে গিয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলতে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর কথা বুঝানো হয়েছে (বুখারী, ২য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা)।

৮. আল্লাহ্‌র দিবস সমূহ স্মরণ করা

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিবস সমূহ স্মরণ করিয়ে দাও; নিশ্চয় সেটার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক বড় ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য (সূরা ইব্রাহীম : ৫)।

মুফাস্‌সির কুল শিরোমণি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.), হযরত মুজাহিদ (রা.), হযরত কাতাদাহ (রা.) এবং অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, উপরোক্ত আয়াতে 'আল্লাহ্ পাকের দিবস' সমূহ বলতে সে সব দিবসকে বুঝানো হয়েছে, যে সব দিবসে আল্লাহ্ পাক তার বান্দাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছেন– (তাফসিরে ইবনে জরীর, খাজেন, মাদারেক, মফাদাতে রাগেব)। উপরোক্ত আয়াতে পাকে আল্লাহ্‌র বিশেষ বিশেষ নিয়ামতরাজি অবতীর্ণ হওয়া এবং উল্লেখযোগ্য ও দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার দিনগুলোকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিশেষ দিন সমূহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর উক্ত বিশেষ দিনগুলো বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ধরার বুকে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর শুভাগমনের দিন অপেক্ষা উত্তম ও পূণ্যময় দিন আর কোনটি হতে পারে?

'আল হাভী লিল ফাতাওয়া'য় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) পৃথিবীর বুকে আগমন করার চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে?

বিশেষ দিনগুলো স্মরণ করার ব্যাপারে অন্য আয়াতে এসেছে, "ঐ শান্তি আমার প্রতি যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি, যে দিন আমার মৃত্যু হবে এবং যে দিন জীবিত পুনরুত্থিত হবো (সূরা মারইয়াম : ৩৩)।

৯. আল্লাহ্ পাকও সাক্ষী হলেন

মহান আল্লাহ্র বাণী, "স্মরণ করুন যখন আল্লাহ্ পাক নবীগণের নিকট থেকে তাঁদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তশরিফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবের সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় তার উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে, (আল্লাহ্ পাক বললেন) তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরয করল, আমরা স্বীকার করলাম। (আল্লাহ্ পাক বললেন) তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও, আমি নিজেও তোমার সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম। সুতরাং যে কেউ এরপর ফিরে যাবে, তবে সে সব লোক ফাসিক (সূরা আল ইমরান : ৮১-৮২)।

এ আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর শুভাগমনের আলোচনা এক বরকতময় কাজ। দ্বিতীয়ত এ বরকতময় কাজের সূচনাও মহা বরকতময় সত্তাগণ করেছেন। তৃতীয়ত উক্ত আয়াতে সম্মানিত নবীগণ (আ.) এর নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে এর মাধ্যমে তাদের উম্মতদেরকেও এ উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (তাফসিরে নূরুল ইরফান)।

১০. রাসূল (দ.) এর আগমন পথ নির্দেশ ও সত্যদ্বীন সহকারে এবং তা বিজয়ী হবে

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "তিনিই আপন রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যদ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, এ জন্য যে, সেটাকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে (সূরা তাওবা : ৩৩)।

১১. রাসূলগণের মুখে আল্লাহ্র হাবীব (দ.) এর আগমনের সুসংবাদ

আল্লাহ্ পাক বলেন, "স্মরণ করুন যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল, আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং ওই সম্মানিত রাসূলের শুভ সংবাদদাতা হয়ে। যিনি আমার পরে তাশরীফ আনবেন। তাঁর নাম হবে 'আহমদ'। অতঃপর যখন আহমদ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আসলেন, তখন তারা বললো, এতো সুস্পষ্ট যাদু (সূরা সাফ : ৬)।

১২. পথভ্রষ্টতা হতে বিশ্ববাসীকে সুপথে আনার জন্যই রাসূল (দ.) এর শুভাগমন

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "তিনিই উম্মী লোকদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন, আর নিশ্চয় তারা ইতোপূর্বে অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ছিলো (সূরা জুমুআহ : ২)।

১৩. মহান আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকরিয়া আদায়

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "যদি তোমরা নিয়ামতের শোকরিয়া জ্ঞাপন করো তা হলে অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তা হলে অবশ্যই আমার শাস্তি কঠিন (সূরা ইবরাহীম : ৭)।
আল্লাহ্‌র হাবীব (দ.) এর চেয়ে বড় নেয়ামত উম্মতের জন্য আর কি হতে পারে?

১৪. আল্লাহ্ পাকই তাঁর হাবীবের (দ.) স্মরণকে সমুন্নত করেছেন

মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি (সূরা আলাম নাশরাহ্ : ৩)।

হাদিসে কুদসীর ভাষায় "ইয়া হাবীবী যিকরকা যিকরী" অর্থ আপনার স্মরণই আমার স্মরণ। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর শান মান স্মরণ ও মর্যাদা নিজেই বৃদ্ধি করেছেন। কানযুল ঈমান ও তাফসিরে নূরুল ইরফান এর পার্শ্ব টিকায় উল্লেখ আছে, "(এর অর্থ হলো) হে প্রিয় হাবীব (দ.) সম্মানিত নবীগণের নিকট থেকে আপনার উপর ঈমান আনার ও আপনার খিদমত করার অঙ্গীকার নিয়েছি। সবার যিকির (স্মরণ) বা চর্চা শুধু পৃথিবীতে, আর আপনার চর্চা পৃথিবী, আরশ ও জান্নাত সর্বত্রই। নিজের নামের সাথে আপনার নাম রেখেছি – কলেমা, নামায, আযান, খুতবা সব জায়াগায়। অন্যান্য নবীগণকে নাম ধরে আহবান করেছি, আর আপনাকে ভাল ভাল উপাধি সহকারে আপনার যিকিরকে (স্মরণ) আমার যিকিরের সম্পূর্ণতা বা পরিণতি সাব্যস্ত করেছি, যাতে আপনার যিকিরকে বাদ দিলে (আমি) মহান রবের যিকির উপকারী নয়। প্রতিটি সময় প্রতিটি জায়গায় আপনার যিকির জারি রেখেছি। সমস্ত বাজার কখনো না কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আপনার বাজার কখনো বন্ধ হবেনা (কানযুল ঈমান ও তাফসিরে নূরুল ইরফান : ১৬৫৩ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর আগমনে খুশি বা ঈদ উদ্‌যাপন করাঃ পবিত্র হাদিসের আলোকে

১. দুই ঈদ ছাড়াও আরো ঈদের প্রমাণ

ইমাম বুখারী (রহ.) 'আল ফাতাহ্' নামক কিতাবের ৮/২৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, "ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের এক লোক হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে (কুরআন শরিফে) এমন একটি আয়াত রয়েছে যদি আমাদের উপর ঐ আয়াত অবতীর্ণ হতো, তাহলে আমরা অবশ্যই ঐ দিনকে ঈদ রূপে গ্রহণ করতাম। তখন তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ আয়াত কোনটি? প্রতি উত্তরে সে বলল, (আয়াতটি হলো) "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনিত করলাম (সূরা মায়িদা : ৩)। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই আয়াতে

করিমা কোন দিন ও কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে তা আমার জানা আছে, অর্থাৎ জুমার দিন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) যখন অবস্থান করছিলেন, তখন উক্ত আয়াতে করিমাটি অবতীর্ণ হয়। ইমাম তিরমিযি (রহ.) তাঁর কিতাবে (৫/২৫০ পৃ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হুবহু হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এ দিন দুই ঈদের সমাবেশ ঘটেছে, অর্থাৎ জুমার দিনও ঈদ, আরাফার দিনও ঈদ। ইমাম তিরমিযি (রহ.) উক্ত হাদিস শরিফটি বিশুদ্ধ বলে মত পোষণ করেন।

উক্ত হাদিস শরিফের আলোকে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এ কথার উপর দৃঢ়তা পোষণ করেছেন, যে দিন বৃহৎ নেয়ামতের প্রকাশ ঘটে সে দিন ঈদ উদ্‌যাপন করা যায়। কেননা যমানা বা কাল এমন এক প্রবহমান পানি যাতে স্বরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। আর তা যতবার মানুষের জীবনে ফিরে আসে ততবার এ দিনে প্রাপ্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ হয় এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উৎফুল্ল হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২. সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর নূরকে সৃষ্টি করেন

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর দরবারে আবেদন করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! আমার মা বাবা আপনার কদমে উৎসর্গিত আপনি অনুগ্রহ করে বলুন, সকল বস্তুর পূর্বে প্রথম আল্লাহ্ পাক কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছিলেন? আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সমস্ত কিছুর পূর্বে তোমার নবীর (আমার) নূরকেই তাঁরই নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ওই নূর আল্লাহ্ পাকের মর্জি মোতাবেক তাঁরই কুদরতি শক্তিতে পরিভ্রমণ করতে লাগল। ওই সময় না ছিলো লৌহ, কলম না ছিলো বেহেশ্‌ত, দোযখ। আর ছিলোনা আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, মানব ও দানব। এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি জগত পয়দা করার মনস্থ করলেন। প্রথমেই ওই নূর মোবারক চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম অংশ দিয়ে কলম, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে লৌহ, তৃতীয় অংশ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করেন। চতুর্থাংশকে চার ভাগে ভাগ করলেন। এর প্রথম অংশ দিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাদের, দ্বিতীয়াংশ দ্বারা কুরসির, তৃতীয়াংশ দ্বারা অন্যান্য ফেরেশ্‌তাদের সৃষ্টি করেন। এই চতুর্থাংশকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে সপ্ত আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে সপ্ত জমিন তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেশ্‌ত-দোযখ এবং পরবর্তী ভাগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা; নাশরুত্ত্বীব বি যিকরিন্নাবিয়ীল হাবীব, ৫ পৃষ্ঠা)।

৩. হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর দেখা সেই তারকা

হযরত সায়্যিদিনা আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) একদা হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল! আপনার বয়স কত? উত্তরে জিব্রাঈল (আ.) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.) আমি তা তো সঠিক জানিনা, তবে এটুকু বলতে পারি

(সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টির পূর্বে) আল্লাহ্ পাকের নূরানী আযমতের পর্দা সমুহের চতুর্থ পর্দায় একটি নূরানী তারকা সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হতো। আমি আমার জীবনে সেই নূরানী তারকা বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি। অতঃপর আল্লাহ্ প্রিয় হাবীব (দ.) ইরশাদ করলেন, মহান আল্লাহ্ পাকের ইজ্জতের কসম করে বলছি, সেই অত্যুজ্জ্বল নূরানী তারকা আমিই ছিলাম (আস সিরাতুল হালভিয়া, ১ম খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা)।

৪. আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.) সত্তাগত, বংশগত ও গোত্রগত দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, একবার আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.) তাঁর বংশ বুনিয়াদ সম্পর্কে বিরূপ কিছু মন্তব্যের কথা জানতে পেরে মিম্বর শরীফের উপর আরোহণ করলেন (বরকতময় ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে), অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বললেন আমি কে? উত্তরে তাঁরা বললেন– আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) ইরশাদ করলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানব-দানব সবই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের (মানব জাতিকে) দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন, অর্থাৎ আরবী ও অনারবী। এতেও আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ে (আরবী) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরব জাতিকে অনেক গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে গ্রোত্রের দিক দিয়ে উত্তম গোত্রে (কুরাইশ) সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদেরকে (কুরাইশ) বিভিন্ন উপগোত্রে ভাগ করেছেন। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে সত্তাগত, বংশগত ও গোত্রগত দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ –[তিরমিযি শরিফ, মিশকাত শরিফ ৫১৩ পৃষ্ঠা, হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত]।

উপরোক্ত হাদিস শরিফের আলোকে তিনটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো– (ক) আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর নবুয়াত ও রিসালাতের ক্ষেত্রে কটুক্তি যেমন বিশ্বাসীদের নিকট অসহনীয়, তার বংশ মর্যাদার বিষয়টিও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কোন প্রকার সামান্যতম অবমাননাও ঈমানদার বিশ্বাসী বরদাশত করতে পারে না, হযরত আব্বাস (রা.) তারই প্রমাণ দিয়েছেন। (খ) আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর বংশ বুনিয়াদ নিয়ে ন্যূনতম সমালোচনাও যে ঈমানদার বিশ্বাসীদের জন্য চরম ক্ষতিকর, তা উম্মতের নিকট উপস্থাপনের জন্য আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) তাৎক্ষণিকভাবে মিম্বরের উপর আরোহন করে নিজের সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের নিকট প্রশ্ন রাখেন। সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ হিসেবে স্বীকার করলে তিনি এ বলে বক্তব্য শেষ করেন নি যে, ঠিক আছে আমাকে এভাবে মানলে চলবে; বরং সাথে সাথে তিনি বিস্তারিতভাবে সর্বক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদামন্ডিত হবার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। যাতে উম্মত আপন নবীকে সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মান্য করার শিক্ষা গ্রহণে সতর্ক হয়। (গ) এখানে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) মূলতঃ তাঁর এ ধরনের জন্ম বৃত্তান্তই বর্ণনা করেছেন। তিনি যে শুধু নবুয়ত ও রিসালতের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত তা নয়, বরং জন্মগত দিক থেকে আরম্ভ করে তাঁর আদর্শ জীবনের সবদিক দিয়ে সার্বিক বিচারে সর্বক্ষেত্রেই তিনি গোটা সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

৫. সমস্ত সৃষ্টি তাঁর আগমনে আনন্দিত হয়

ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী তাঁর "আন নে'মাতুল কুবরা" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) মাতৃগর্ভে মাহে রজবের প্রথম জুমার রাত্রে তাশরিফ এনেছেন।

উক্ত বরকতময় রাতে অসংখ্য আলৌকিক ঘটনা দৃশ্যমান হয়েছিল। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আমেনার (রা.) গর্ভে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) তাশরিফ আনার নির্দেশনাবলীর মধ্যে একটি ছিল যে কুরাইশ গোত্রের প্রতিটি চতুষ্পদ জন্তু হযরত আমেনার (রা.) গর্ভ ধারণের শুভ রাত্রে মানুষের ন্যায় কথা বলেছিল এবং স্বীকৃতি দিয়েছিল যে আজ রাতে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) মাতৃগর্ভে পদার্পন করেছেন। কাবা ঘরের প্রভুর নামে শপথ! নিশ্চয় তিনি (দ.) গোটা পৃথিবীর ইমাম এবং আলোকবর্তিকা (আন নে'য়ামাতুল কুবরা, ২৩ পৃষ্ঠা)।

বুখারী শরিফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা কুস্তালানী (রহ.) বলেন, উক্ত মোবারক রাতে পৃথিবীর সকল রাজা বাদশাহের সিংহাসন ঝুঁকে গিয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিম সর্বস্থানে জন্তু সমূহ মাতৃগর্ভে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর আগমনী বার্তা প্রচারে সারা রাত ব্যস্ত ছিল। অনুরূপভাবে জলে স্থলের প্রাণী সমূহে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর আগমনী সংবাদ প্রেরণে মশগুল ছিল। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন প্রতি মাসে অদৃশ্য হতে আসমান জামিনে এক বিশেষ আহ্বান হত যে, তোমরা পরস্পর শুভ সংবাদ প্রচার করতে থাকো, যেহেতু বিশ্ব জাহানের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করার সময় নিকটবর্তী হয়েছে (মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, ১ম খণ্ড)।

৬. দিবসকে নির্দিষ্ট করে তা উদ্‌যাপন করা

আশুরার (১০ মহররম) দিনে ইয়াহুদীগণ রোযা রাখতো, কারণ এই দিন মহান আল্লাহ্‌ হযরত মূসা (আ.)কে ফিরাউনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। এটা শুনে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) ইরশাদ করলেন, "মুসা (আ.) এর বিষয়ে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার, অতঃপর তিনি এ দিন রোযা রাখেন এবং (উম্মতকে) ওই দিন রোযা পালনের আদেশ দান করলেন (বুখারী শরিফ, ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা; মুসলিম শরিফ, ১ম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) আরো ইরশাদ করেন, আশুরা আল্লাহ্‌ পাকের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর অন্যতম। অতএব যার ইচ্ছা হয় সে ওই দিন রোযা পালন করবে, আর ইচ্ছা হলে নাও রাখতে পারে। (অর্থাৎ, এখন আশুরার রোযা ফরয নয়, বরং সুন্নাত) (আবু দাউদ শরিফ, ১ম খণ্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা)।

৭. প্রতি সোমবার আবু লাহাবের আযাব হালকা করা হয়

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্ম সংবাদ বা মিলাদ শরিফের খুশিতে আবু লাহাব সুয়াইবাহ নামক দাসীকে তর্জনী ও মধ্যমা দুটি আঙ্গুলের ইশারায় আজাদ করার কারণে প্রতি সোমবার

এই আঙ্গুল দুটির মধ্যে কিছু পানি জমে থাকে, আর সে ওই পানি চুষে পান করে ও প্রতি সোমবার তার আযাবকে হালকা করা হয়– (বুখারী শরিফ, ২য় খণ্ড, ৭৬৪ পৃষ্ঠা)। তার এ কর্মের কর্মফল অবশিষ্ট ছিলো, অন্যান্য কাজের ন্যায় বিনষ্ট হয়ে যায়নি। তাও আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এরই বরকতে (বুখারী শরিফের হাশিয়া, ২য় খণ্ড, ৭৬৪ পৃষ্ঠা)।

আবু লাহাবের মত কাফির যার তিরস্কার সূরা লাহাবে করা হয়েছে, সে যদি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদে আনন্দিত হওয়ার কারণে জাহান্নামে সুফলপ্রাপ্ত হয়, তবে একজন তাওহীদবাদীর অবস্থা কি রূপ হবে যে, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদে আনন্দ উদ্‌যাপন করে এবং সামর্থানুসারে তাঁর মহব্বতে খরচ করে। আমি শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এর বিনিময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এ হবে যে, তিনি তাঁর সর্বব্যাপী অনুগ্রহ ক্রমে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা; আল হাভী লিল ফাতাওয়া, ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা)।

পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, আলোচ্য হাদিসে মিলাদ উদ্‌যাপনকারীদের দলিল বিদ্যমান। যারা পবিত্র মিলাদের রাতে আনন্দ উৎসব ও দান-খয়রাত করে থাকে; অর্থাৎ আবু লাহাবের মতো কাফির যার কুৎসায় কুরআন শরিফে (সূরা লাহাব) অবতীর্ণ হয়েছে, সে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্মের খুশিতে বা তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য (সুয়াইবাহ) দাসীকে আযাদ করেছে, যার ফলে তাকে পুরস্কৃত করা হলো (অর্থাৎ প্রতি সোমবার তার আযাব লঘু করা হয়ে থাকে) তাহলে ওই ঈমানদার মুসলমান যার হৃদয়ে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর প্রেমে ও তাঁর শুভ আবির্ভাবের খুশিতে ভর্তি তার কি অবস্থা হবে? (অর্থাৎ অবশ্যই তারা এ পূণ্যময় কাজের দরূন অধিক হারে উপকৃত হবে)। অনুরূপভাবে তাঁর 'মা-সাবাতা বিসসুন্নাহ' নামক কিতাবে আলোচনা করেছেন।

৮. আল্লাহ্র হাবীব (দ.) নিজেই নিজের মিলাদ উদ্‌যাপন করেছেন

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র হাবীব (দ.) এর মহান দরবারে সোমবার রোযা পালন সম্পর্কে আরয করা হলো, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (রহ.) উত্তরে ইরশাদ ফরমালেন, ওই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিন আমার উপর ওহী নাযিল করা হয়েছে– (মুসলিম শরিফ ও মিশকাত শরিফ ১৭৯ পৃষ্ঠা)। আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর পবিত্র মিলাদের দিবস অর্থাৎ প্রতি সোমবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) স্বয়ং প্রতি সোমবার মিলাদে পাকের শুকরিয়া স্বরূপ রোযা পালন করতেন। মুসলমানগণ তো বছরে একবার ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন করছে। রবিউল আওয়াল মাসে। আর আলোচ্য হাদিসে প্রতি সোমবার মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে রোযা পালন করা

সুন্নাত প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ ওই দিন যাতে আমার উম্মতের ঈমানদার মুসলমানদের নিকট স্বরণীয় বরণীয় হয়ে থাকার মানসে আমি (দ.) রোযা রেখে থাকি।

৯. আল্লাহ্‌র হাবীব (দ.) এর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করলে তাঁর (দ.) শাফায়াত নসিব হবে

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি তার ঘরে আল্লাহ্‌র হাবীব (দ.)’র পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, এমন সময় আল্লাহ্‌র হাবীব (দ.) সেখানে তাশরিফ অনলেন এবং তা দেখে ইরশাদ করলেন, “তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (অর্থাৎ– সমবেত হয়ে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করায় তোমাদের অন্য কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত হয়ে গেল) (“আত্তানভীর ফিল মাওলিদিল বাশিরিন্নাযির” নামক কিতাবের বরাতে “মজমুআহ-ই-ফাতাওয়াহই আযিযিয়াহ”, ২ পৃষ্ঠা)।

হযরত আবু দ্বারদা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর সাথে হযরত আমের আনসারী (রা.) এর ঘরে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আমের আনসারী (রা.) তার সন্তানদের ও তার স্বগোত্রীয় লোকেদের সাথে নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন, এই দিনটি; এই দিনটি; তখন আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) ইরশাদ করলেন, (হে আমের আনসারী!) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন, আর ফেরেশ্‌তাগণ তোমার জন্য শাফাআত কামনা করছে। তা ছাড়া যারা তোমার মতো আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (অর্থাৎ মিলাদ মাহফিল করবে) তারা তোমার মতোই নাযাত লাভ করবে (“আত্তানভীর ফিল মাওলিদিল বাশিরিন্নাযির” নামক কিতাবের বরাতে “মজমুআহ-ই-ফাতাওয়াহই আযিযিয়াহ”, ২ পৃষ্ঠা)।

আলোচ্য হাদিস শরীফ দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করতেন। আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার ফলে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর শাফাআত নিশ্চিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.)'র জন্ম বৃত্তান্ত নিজ সন্তানদের এবং স্বগোত্রীয়দের শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্মদিনে তাঁর বরকতময় জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। মিলাদ শরিফ পাঠকরা এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.)’র জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত।

আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর আগমনে খুশি বা ঈদ উদ্‌যাপন করা: সম্মানিত সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কেরাম এর মতামতের আলোকে আল্লামা শেহাব উদ্দীন বিন হাজরুল হায়তামী (রহ.) তাঁর প্রণীত “আননে’মাতুল কুবরা ‘আলাল ‘আলম ফি মাওলেদে সায়্যেদ ওলাদে আদম” নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

১. আমিরুল মুমিনীন, খলিফাতুর রাসূল (দ.) সায়্যেদেনা সিদ্দিকে আকবর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদ পাঠ করার জন্য একটিমাত্র দিরহাম খরচ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।

২. আমিরুল মুমিনীন, খলিফাতুর রাসূল (দ.) সায়্যেদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ইসলামকেই জীবিত করেছে।

৩. আমিরুল মোমিনীন, খলিফাতুর রাসূল (দ.) সায়্যেদেনা হযরত উসমান (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদ পাঠ উপলক্ষে একটি মাত্র দিরহাম খরচ করবে, সে ব্যক্তি যেন ঐতিহাসিক বদর ও হুনাইন এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

৪. শাহেনশাহে বেলায়ত মুশকিল খোশা, আমিরুল মোমিনীন, খলিফাতুর রাসূল (দ.) সায়্যেদেনা মাওলা আলী (কা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.)-এর মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্দেশ্যে এ উৎসবকে সর্বদা উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমান সহকারেই পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করবে এবং বিনা হিসেবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

৫. ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকতো তবে তাও আমি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদ উপলক্ষে খরচ করতাম।

৬. হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয় এবং তাঁর মর্যাদাকেই প্রাধান্য দেয় সে ব্যক্তি সফল ঈমানদার।

৭. হযরত মারুফ করখী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে পানাহারের আয়োজন করে, মুসলিম ভাইদের একত্রিত করে, আলোকসজ্জা করে নতুন পোষাক পরিধান করে এবং খুশব গোলাপ লোবান প্রয়োগে সুবাসিত করে রোজ কিয়ামতে প্রথম শ্রেণীর নবীদের এবং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের সাথে তাঁর হাসর হবে।

৮. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপনে সামান্য পরিমাণ লবণ, আটা বা অন্য কোন খাদ্য বস্তু নিয়ে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদ পাঠ করবে নিশ্চয় তাতে এবং তদসংশ্লিষ্ট সব কিছুতে বরকত হয়। কেননা সে খাবার ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থিরতায় থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাক তার ভক্ষকের গুণাহ্ ক্ষমা করেন। যদি পানির উপর মিলাদ পাঠ করা হয়, আর সে পানি যদি কেউ পান করে তবে তার অন্তরে এক হাজার নূর ও রহমত প্রবেশ করবে। তার অন্তর থেকে এক হাজার বিশেষ রোগ ও সংকীর্ণতা দুরিভূত হয়ে যাবে। আর সে অন্তর সেদিন মৃত্যুবরণ করবে না, যে দিন বহু অন্তরের মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি কোন মুদ্রার উপর মিলাদ পাঠ করবে সে মুদ্রা রৌপ্যের হোক বা স্বর্ণের হোক, সে মুদ্রা যদি অন্য মুদ্রার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় তবে সে সব মুদ্রায় বরকত অবতীর্ণ হয় এবং সে মুদ্রার বাহক কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না। আর আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদের বরকতে তার হাত কখনো অর্থ শূন্য হবে না।

৯. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের একত্রিত করে, খাবার তৈরী করে, কোন স্থানে সভার আয়োজন করে এবং তাতে কোন ইবাদত সম্পন্ন করে, রোজ কিয়ামতে সিদ্দিকীন, শোহাদা ও সালেহীনের (আল্লাহ্র নিকট যাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে) সাথেই সে ব্যক্তির হাশর হবে, আর তাদের সাথেই সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

১০. হযরত সির্রি সকতী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে মিলাদ পাঠের ইচ্ছা করলো, সে প্রকৃতপক্ষে বেহেশ্তের বাগান সমূহের একটা বাগানেই মিলাদ পাঠের ইচ্ছা করলো। কেননা সে স্থানে মিলাদ পাঠের ইচ্ছা পোষণে শুধু আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এরই মুহাব্বত বা ভালবাসারই প্রাধান্য ছিল। আর আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তে আমার সাথেই থাকবে।

১১. সুলতানুল আরেফিন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) তাঁর রচিত কিতাব "আল ওয়াসায়েল ফি শরহিস শামায়েল" এ উল্লেখ করেছেন, যে গৃহে, মসজিদে কিংবা মহল্লায় আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদুন্নবী (দ.) এর মাহফিল করা হয়, তখন অবশ্যই সে গৃহ, মসজিদ বা মহল্লা অসংখ্য ফেরেশ্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, আর উক্ত স্থান সমূহ অবস্থানকারীদের জন্য সালাত পাঠ করে (অর্থাৎ তার গুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করে) এবং আল্লাহ্ পাক তাদের সবাইকে সাধারণভাবে রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর নূরের মালা পরিহিত ফেরেশ্তাকুল হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল ও আজরাইল (আ.) মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে মাহফিল আয়োজনকারীর জন্য সালাত পাঠ করেন। অর্থাৎ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। (আন নে'মাতুল কুবরা 'আলাল আলম ফি মাওলেদে সৈয়্যেদে ওলাদে আদম, ৭-১১ পৃষ্ঠা)।

শায়খুল ইসলাম, হাফেজুল আসর ইমাম আবুল ফজল ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) এর কাছে মিলাদ মাহফিল উদ্যাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর জবাব এভাবে প্রদান করেন, আমার কাছে মিলাদ শরিফের আদি সূচনা প্রমাণ মিলেছে সহিহ্ (বুখারী ও মুসলিম) হাদিস দ্বারা যেখানে উল্লেখিত আছে যে যখন আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) ইহুদীদের আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখেন। তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এদিন কেন রোজা রাখ? তারা বললো, এ দিন আল্লাহ্ পাক ফেরআউনকে ডুবিয়েছেন এবং হযরত মুসা (আ.)কে নাযাত দিয়েছেন, তাই আমরা আল্লাহ্র বারগাহে শোকর আদায় কল্পে প্রতি বছর এ দিনে রোযা রাখি। এ পবিত্র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে কোন নির্ধারিত দিনে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোন করুণা বা বখশিশ বা কোন বিপদ দূরীভূত হওয়ায় আল্লাহ্ পাকের শোকরিয়া আদায় করা উচিত এবং প্রতি বছর এ দিনকে স্মরণ করা খুবই সমীচীন। আল্লাহ্ পাকের শোকরিয়া নামায, রোযা, সদকা, তিলাওয়াতে কুরআন ও অন্যান্য নেক কাজ দ্বারা আদায় করা যায়। আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহের মধ্যে আল্লাহ্র প্রিয়

হাবীব (দ.) এর বিলাদত থেকে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? এ জন্য এই দিন নিশ্চয় যথাযথভাবে পালন করা উচিত। (হুসনুল মাকসুদ ফি 'আমালিল মাওলুদ, ২৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) বলেন, ইমাম বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.) নিজের পক্ষ থেকে নিজের আক্বিকা করেছেন। এই কাজ (আক্বিকা) যেটা আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) নিজে করেছেন, সেটা ছিলো তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁকে সমস্ত জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরণের জন্য শোকরানা প্রকাশ এবং তাঁর উম্মতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ব্যাপারটা এরকমই যেমন আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) স্বয়ং স্বীয় সত্তার প্রতি দরূদ-সালাম প্রেরণ করলেন। অতএব এটা আমাদের জন্যও মুস্তাহাব যে শোকরিয়া জ্ঞাপন স্বরূপ আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদে মুসলমানদের সার্বজনীন সমাবেশ করা, পানাহারের ব্যবস্থা করা এবং এভাবে অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের মাধ্যমে আনন্দ আহ্লাদ প্রকাশ করা (হুসনুল মকসূদ ফি 'আমালিল মাওলুদ, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)।

ইমাম শামসুদ্দীন আস সাখাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, মাহফিলে মিলাদুন্নবী (দ.) এর প্রচলন কুরুনে সালাসা সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ এর যুগের পর শুরু হয়েছিলো। যথা সম্ভব খালেস নিয়তের উপর ভিত্তি করে এর সূচনা করা হয়েছিল। এরপর থেকে সারা বিশ্বে এবং বড় বড় শহরে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর পবিত্র বিলাদত মাসে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন হয়ে আসছে এবং এর মর্যাদা ও শান শওকত, উন্নত যিয়াফত ও বর্ণাঢ্য খানা পিনার আয়োজনের মাধ্যমে আজও অটল রাখা হয়েছে। এখনও মিলাদুন্নবীর (দ.) মাসে নানারকম দান খয়রাত করা হয়, আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং অধিক হারে নেক কাজ করা হয়। বরং যখন আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর বিলাদতের মাস ঘনিয়ে আসে, তখন থেকে বিশেষ আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ফলে এ পবিত্র মাসের বরকতে আল্লাহ্‌ পাকের অনেক বড় বড় করুণা ওদের প্রতি প্রকাশ পায়। এটা পরীক্ষিত আমল। যেমন ইমাম শামসুদ্দীন বিন আল জযরী আল মক্কী বর্ণনা করেছেন যে, মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপনের ফলে সারা বছর নিরাপদ, শান্ত থাকে এবং মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ সহসা পাওয়া যায়। (আল মাওলুদুর রবী ফি মাওলেদুন্নবী, ১২-১৩ পৃষ্ঠা)।

স্পেন ও পাশ্চাত্য দেশের শহরগুলোতে মিলাদুন্নবী (দ.) এর পবিত্র রাতে রাজা-বাদশাহগণ জুলুস বের করতেন। সেথায় বড় বড় ইমাম ও ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করতেন। মাঝপথে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক এসে তাঁদের সাথে যোগ দিতেন এবং কাফিরদের সামনে (নারায়ে তকবীর, নারায়ে রিসালত শ্লোগান দিয়ে) সত্যের বাণী তুলে ধরতেন। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনে রোমবাসীরাও কোন অংশে ওদের থেকে পিছপা ছিল না। তারাও অন্যান্য বাদশাগণের মতো মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন। হিন্দুস্থানের শহরগুলোতে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে উচ্চস্তরের ওলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট লিখকগণ আমাকে বলেছেন যে, হিন্দুস্থানের লোকেরা অন্যান্য দেশের

তুলনায় ব্যাপক হারে এ পবিত্র বরকতময় দিনে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন। (আল মাওরুদুর রবী ফি মাওলেদুন্নবী, ১৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম সাখাবী (রহ.) বলেন, "মক্কাবাসী কল্যাণ ও বরকতের খনি, তাঁরা সেই প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন। যেটা আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জন্মস্থান। এটা সাউকুল লাইলে অবস্থিত।

তারা এ জন্য মনোনিবেশ করেন যে, যাতে এর বরকতে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এ সব লোক মিলাদুন্নবীর দিন আরও অনেক কিছুর আয়োজন করে থাকেন। এ আয়োজনে আবেদ, নেককার, পরহেজগার, দানবীর কেউ বাদ যায় না। বিশেষ করে হেজাজের আমির বিনা সংকোচে সানন্দে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর আগমন উপলক্ষে ঐ জায়গায় এক বিশেষ নিশান তৈরী করা হতো। প্রথম যুগে এটা ছিল না। পরবর্তীতে মক্কার বিচারক ও বিশিষ্ট আলেম আল বোরহানিশ শাফীই মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে আগত জিয়ারতকারী খাদেম ও সমবেত লোকদেরকে খানা ও মিষ্টি খাওয়ানোকে পছন্দনীয় কাজ বলে রায় দিয়েছেন। (হেজাজের আমীর হাবীব (দ.) এর মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে স্বীয় আবাস গৃহে সাধারণ লোকদের জন্য ব্যাপক পানাহারের ব্যবস্থা করতেন এবং আশা পোষণ করতেন যেন এর বদৌলতে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত দূরীভূত হয়ে যায়। তাঁর ছেলেও খাদেম এবং মুসাফিরের বেলায় স্বীয় পিতার অনুসারী ছিলেন। ওসব খানা পিনার মধ্যে কোন কিছু বাদ যেতনা, কেবল ধুমপান ছাড়া আর ওসব খানা পিনার মধ্যে নানা ফলের সুগন্ধ ভরপুর থাকতো। (আল মাওরুদুর রবী ফি মাওলেদুন্নবী, ১৫ পৃষ্ঠা)

মদিনাবাসীগণ ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। বাদশাহ মোজাফ্‌ফর শাহ আরিফ অধিক আগ্রহী এবং সীমাহীন আয়োজনকারী ছিলেন। আবু শামা (রহ.) ইমাম নববীর অন্যতম শেখ এবং বিশেষ বুজুর্গ ছিলেন, স্বীয় কিতাব "আল বায়াস 'আলাল কদয়ে ওয়াল হওয়াদিছ" এ বাদশার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন এ রকম ভাল কাজ সমূহ ওনার খুবই পছন্দ এবং তিনি এ ধরনের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনকারীদের উৎসাহ দান ও প্রশংসা করতেন। ইমাম জযরী (রহ.) এর সাথে আরও সংযোজন করে বলেন, এসব অনুষ্ঠানাদি উদযাপনের দ্বারা কেবল শয়তানকে (বিরোধিতাকারীদেরকে) নাজেহাল এবং ঈমানদারের উৎসাহ উদ্দীপনা দানই উদ্দেশ্য হওয়া চাই। আরও বলেন যেহেতু ঈসায়ীরা তাদের নবীর জন্মের রাতকে খুব শান শওকতের সাথে উদ্‌যাপন করে থাকে সেহেতু মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর ইজ্জত-সম্মান করার অধিক হকদার এবং তাঁর জন্মদিনে যতদুর সম্ভব আনন্দ আহলাদ প্রকাশ করা উচিত। (আল মাওরুদুর রবী ফি মাওলেদুন্নবী, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, আমরা তো এ মাসের (রবিউল আওয়াল) সব রাত্রে ও দিনে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান উত্তম মনে করি। এ ব্যাপারে মিশর ও সিরিয়ার প্রধান বিচারক ইবনে জামআর আমলটি প্রণিধানযোগ্য। যখন তিনি মদিনা মনোয়ারায় থাকতেন,

তখন তিনি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদ উপলক্ষে খাবার তৈরী করতেন এবং লোকদেরকে খাওয়াতেন। তিনি বলতেন, যদি আমার সামর্থ আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে আমি সারা মাস এ ধরনের মিলাদ শরিফের মাহফিল করতেই থাকবো। আমি (মোল্লা আলী ক্বারী) যদিওবা এ ধরনের জিয়াফতের আয়োজন করতে পারিনি তবে কাগজে লিখে গেলাম যে এ ধরণের মহৎ জিয়াফত ততদিন চালু থাকে যতদিন এ দুনিয়া বাকী থাকে। কোন বছর মাস নির্ধারিত নেই যে কোন সময় করা যাবে। এ জন্য আমি আমার কিতাবের নাম রেখেছি। (আল মাওরুদুর রবী ফি মাওলেদুন্নবী, ১৮ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে জুযী (রহ.) বলেন, সবসময় মক্কা মুকার্‌রমা, মদিনা মনোয়ারা, মিসর, সিরিয়া, ইয়ামেন মোট কথা পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমস্ত শহরের বাসিন্দারা আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করে আসছে। যখন তারা রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখেন তখন তাদের খুশির সীমা থাকেনা। মিলাদ পাঠ ও সামার বিশেষ আয়োজন করেন এবং অসীম সওয়াব ও সাফল্য লাভ করেন। (আল মাওরুদুর রবী ফি মাওলেদুন্নবী, ৫৮ পৃষ্ঠা)

“ইরশাদুস সারী” এর প্রণেতা ইমাম কুসতালানী (রহ.) বলেন, সবসময় আহলে ইসলাম আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর পবিত্র বেলাদতের মাসে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে আসছে। রবিউল আওয়াল মাসে লোকদেরকে খাবার পরিবেশন করে সদকা খয়রাতের সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আনন্দ প্রকাশ করে, অধিকহারে নেক কাজ এবং মিলাদ শরিফের আয়োজন করে প্রত্যেক মুসলমান মিলাদ শরিফের বরকতে ফয়েজ লাভ করে। মিলাদুন্নবী (দ.) এর পরীক্ষিত বিষয় সমূহের মধ্যে এটিই একটি যে, যে বছর মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন করা হয় সে বছর শান্তিতে অতিবাহিত হয়। অধিকন্তু (এ আমল) নেক উদ্দেশ্য ও আন্তরিক বাসনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের সুসংবাদ। আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন যিনি মিলাদুন্নবী (দ.) এর মাসের রাত সমূহে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করে আর ওই সব লোকের রোগ-যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে, যাদের অন্তর আগ থেকে নবী বিদ্বেষে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। (আল মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, ২৭ পৃষ্ঠা)।

শায়খুল মুহাক্কিক শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, অনেকদিন থেকে এটা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত যে রবিউল আওয়াল মাসে মিলাদুন্নবী (দ.) এর মাহফিলের আয়োজন করে, সদ্‌কা-খয়রাত করে এবং আনন্দ-আহ্লাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করে। ওদের প্রচেষ্টা এটাই হয়ে থাকে যে, এ দিনসমূহে যেন অধিক হারে নেক কাজ করে, এ উপলক্ষে তারা পবিত্র বিলাদত ঘটনাবলী বর্ণনার ব্যবস্থা করে থাকে (মা সাবাতা বিস সুন্নাহ, ১০২ পৃষ্ঠা)।

তিনি আরও বলেন, নিঃসন্দেহে শবে মিলাদ লাইলাতুল কদর থেকে উত্তম। এজন্য যে মিলাদ এর রাত স্বয়ং আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (দ.) এর বিকাশের রাত। আর শবে কদর আল্লাহ্ পাক তার প্রিয় হাবীব (দ.)কে দান করেছেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, যে রাত আল্লাহ্র প্রিয়

হাবীব (দ.) এর বিলাদতের কারণে উত্তম সে রাত অবশ্যই ওই রাতের চেয়ে উত্তম যা আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.)কে দান করা হয়েছে। শবে কদরের মর্যাদা ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে আর শবে মিলাদ আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর প্রকাশের কারণে। শবে কদরের রাত আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া। আর লাইলাতুল মিলাদ বা আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর বিলাদতের রাত সকল জাহানের উপর আল্লাহ্‌ পাকের ফজল ও এহসান। কেননা তিনি তো রহমাতুল্লিল আলামীন বা সকল সৃষ্টির জন্য রহমত। তাই লাইলাতুল কদরের চেয়ে মিলাদুন্নবী (দ.)ই উত্তম। (মা-সাবাতা বিস সুন্নাহ, ৭৮ পৃষ্ঠা)।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) বলেন, আমাদের ওলামায়ে কেরাম মাওলুদ শরিফের ব্যাপারে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করে থাকেন। অবশ্য আমি জায়েয এর পক্ষে যখন জায়েযের সুরত মওজুদ আছে, তখন কেন বাড়াবাড়ি করতে যাব। আমাদের জন্য হারামাইন শরিফাইনের অনুসরণই যথেষ্ট। অবশ্য কিয়ামের সময় জন্মক্ষণের আকীদা পোষণ না করা চাই। যদি তাশরিফ আনয়নের আকীদাহ পোষণ করে কি করে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা সৃষ্টি জগত স্থান-কালের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু রুহের জগত এ দু'বিষয় থেকে মুক্ত। তাই জাতে পাক আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.) এর জিকির বা স্মরণ কি করে নিন্দনীয় হতে পারে? অবশ্য যে সব বাড়াবাড়ি লোকেরা প্রচলন করেছে সে সব না করা চাই। আমার নীতি হচ্ছে আমি মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করি বরং বরকতের উসিলা মনে করে প্রতি বছর মিলাদ শরিফের আয়োজন করি এবং কিয়ামে আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়ে থাকি। (হাপ্ত মাসায়েল, ৮ পৃষ্ঠা)।

সকল সম্মানিত ঐতিহাসিকগণ অভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র প্রিয় হবিব (দ.) হিযরত করছেন, এ খবর শোনার পর থেকে আনন্দের আবেগে মদীনাবাসীদের ঘুম-বিশ্রাম যেন হারাম হয়ে গিয়েছিল। তাদের বহু প্রতীক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত পথ প্রদর্শককে এক পলক দেখে নিতে এবং স্বাগত জানাতে। অবশেষে চারিদিক উল্লাস ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস যেন মুখরিত করে তুলল।

"এ যে এসে গেছেন আল্লাহ্‌র নূর। নারী-পুরুষ বালক-বালিকা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল; "জা-আ রাসুলুল্লাহ্‌ জা-আ নাবিউল্লাহ (দ.)" – আল্লাহ্‌র রাসূল এসেছেন আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন: শুভেচ্ছা স্বাগতম। বনী নাজ্জারের বালিকারা সমস্বরে প্রশস্তি গাইতে লাগলো। আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব (দ.)কে 'কাসওয়া' বহন করে নগরে প্রবেশ করলে মহিলারা বাড়ির খোলা ছাদে উঠে গাইতে লাগলো– "চাঁদ উঠেছে, ছানিয়াতিল ওয়াদা পর্বত মালার পাশ দিয়ে যেন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েছে। এই মহা সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।" (আসাহুস সিয়ার, কিমিয়ায়ে সাদাত, সিরাতে মোস্তাফা ইত্যাদি)।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

১. পবিত্র কুরআন
২. তাফসিরে রূহুল মা'আনী
৩. তাফসিরে রূহুল বায়ান
৪. তাফসিরে কবীর
৫. তাফসিরে বায়জাবী
৬. তাফসিরে খাজেন
৭. তাফসিরে মাদারেক
৮. তাফসিরে নুরুল ইরফান
৯. তাফসিরে ইবনে জারীর
১০. তাফসিরে জালালাইন
১১. মুফরাদাতে রাগেব
১২. কানযুল ঈমান খাযাইনুল ইরফান
১৩. সহিহ্ বুখারি
১৪. সহিহ্ মুসলিম
১৫. সুনানে আবু দাউদ
১৬. সুনানে ইবনে মাযাহ
১৭. মিশকাতুল মাসাবিহ
১৮. মাওয়াহেবে লাদুনিয়া
১৯. আস সিরাতুল হালাভিয়া
২০. আত তানভীর ফি মাওলিদিল বশির ওয়ান নযীর
২১. আন নে'মাতুল কুবরা 'আলাল আলম ফি মাওলেদে সায়্যেদে ওলাদে আদম
২২. মজমুআহ-ই ফাতাওয়ায়ে আযিযীয়্যাহ
২৩. মা'সাবাত বিস্‌সুন্নাহ
২৪. আদ্ দুররুস সামিন ফি মোবাশ্যারাতিন্নাবীয়িল আমিন
২৫. ফয়জুল হারামাইন
২৬. আসিহুস সায়ির
২৭. সিরাতে মুস্তফা
২৮. কিমিয়ায়ে সাদাত
২৯. হাপ্ত মাসায়েল
৩০. আয়িম্মায়ে কেরাম ও মাহাদ্দিসীনে এজামের দৃষ্টিতে জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী
৩১. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন
৩২. কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী

লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব তাৎপর্য

এস এম এম সেলিম উল্লাহ

সাধারণত ঈদ শব্দের অর্থ আমরা জানি খুশি। আল মান্‌জেদ, আল কামুস, সহ আরবি, ফারসি, উর্দু অভিধানগুলোতে স্পষ্ট এইভাবে লিখা আছে।

ঈদের বাংলা শব্দের অর্থ খুশি কেন রাখা হয়েছে?
বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) তার 'তাফসীরে কাবীরে' এই শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন,

ঈদকে ঈদ এইজন্য নাম রাখা হয়েছে, এই দিনটি ফিরে আসে প্রত্যেক বছর নতুন নতুন খুশি নিয়ে।

'মিলাদ' শব্দটির মূল 'বিলাদত' যার অর্থ হলো জন্ম। অতএব, আরবী ভাষায় মিলাদ শব্দটি জন্মের স্থান ও সময়কে বোঝায়। শরিয়তের আলোকে আমরা মিলাদ বলতে বুঝি সেই সব ঘটনা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বিলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের সময় ঘটেছিল।

মিলাদ+নবী শব্দ দুটিকে একত্রে মিলিয়ে মিলাদুন্নবী বলা হয়। সমাজে এর তিনটি শব্দ প্রচলিত আছে মিলাদ, মাওলিদ ও মাওলূদ। 'মিলাদ' অর্থ জন্মের সময়, 'মাওলিদ' অর্থ জন্মের স্থান, 'মাওলূদ' অর্থ সদ্যপ্রসূত সন্তান। আর 'নবী' শব্দ দ্বারা বুঝায় হুজুর (দ.)কে। শাব্দিক অর্থে 'মিলাদুন নবী' বলতে হুযুর (দ.)এর বিলাদত শরিফ বা জন্ম বৃত্তান্তকে বুঝানো হয়ে থাকে।

বিভিন্ন অভিধানে মিলাদ শব্দটির অর্থ কিভাবে লিখা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

আল্লামা ইবনে মানযুর আল আফরীকি (ওফাত: ৭১১ হি:) লিখেছেন
মিলাদ : যে সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সে সময়ের নাম।
গিয়াছুল লুগাতে লিখিত আছে;
মিলাদ শব্দটির মীম অক্ষর যের বিশিষ্ট যার অর্থ জন্মকাল।
মুন্তাখাব অভিধানে লিখিত আছে;
নবজাতক শিশু, জন্মকালীন ঘটনা, জন্মের সময়কাল।
ইংরেজী ও আরবি অভিধানে আছে
'মিলাদ' অর্থঃ birth (process of being born, coming into the world) অর্থাৎ পৃথিবীতে আগমনের সময়।

পারিভাষিক অর্থ: (১) আল্লামা মোল্লা আলী আল ক্বারী (রহ.) তার বিখ্যাত কিতাব "আল মাওরিদুর রাবী ফি মাওলিদিন নাবি" তে বলেন; মিলাদ বলতে নবীর জন্মবৃত্তান্ত তার মুজিযাসমূহ ও সিরাতের আলোচনার জন্য একত্রিত হওয়া, আর যথাযথ প্রশংসা সহ তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পড়া। তাঁর উম্মতের জীবিত ও মৃতের জন্য দোয়া, অতঃপর তাবার্‌রুক (খাবার) আয়োজন করে মানুষের অন্তরে নবীপাক (দ.)র জন্মের আনন্দিত হওয়া।

ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) পবিত্র কোরআনের আলোকে:

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিয়ামত প্রাপ্তির পর তার শুকরিয়া আদায়ের জন্য কুরআনে বহুবার তাগিদ দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহ বা নিয়ামত হল রাসূল (দ.)। তাই রাসূল (দ.)কে পেয়ে খুশি, আনন্দ, উল্লাস উদ্‌যাপন করা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ।

যেমন: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: "হে হাবীব! আপনি বলে দিন আল্লাহ্‌র (ফদ্বল) অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত (রহমাতাল্লিল আলামিন) প্রাপ্তিতে তাদের (মু'মিনদের) খুশি (ঈদ) উদ্‌যাপন করা উচিত এবং আর সেটা হবে তাদের জমাকৃত ধন সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়" –(সূরা ইউনুস-৫৮)।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র (ফদ্বল) অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্‌র রহমত (রহমাতাল্লিল আলামিন) পাওয়ার পরে মুমিনদের খুশি অর্থাৎ ঈদ উদ্‌যাপন করার নির্দেশ মহান আল্লাহ্‌র। এর ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) (ওফাত ৯১১ হি.) লিখেন–
"ইমাম আবু শায়খ ইস্পাহানী (রহ.) তার তাফসীরে উল্লেখ করেন, সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ্‌র ফদ্বল বা অনুগ্রহ দ্বারা এই ইলম বা জ্ঞানকে এবং (রহমত) দ্বারা নবী করিম (দ.) কে বোঝানো হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন– হে হাবীব আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি– (সূরা আম্বিয়া-১০৭)।" সৈয়দ শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (রহ.) (ওফাত ১২৭০ হি.) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেন;
"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন নিশ্চয়ই (ফদ্বলুল্লাহ্) বা অনুগ্রহ হলো ইলমে দ্বীন এবং রহমত হল নবী করীম (দ.)।"

ইমাম সৈয়দ মাহমুদ আলূসী (রহ.) উল্লেখ করেন– "হযরত খতিবে বাগদাদী (রহ.) ইমাম ইবনে আসাকীর (রহ.) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ফদ্বল (অনুগ্রহ) দ্বারাও নবী করিম (দ.) কে বুঝানো হয়েছে।" "সাহাবীদের তাফসীর হল মারফু হাদিস এর ন্যায়"। ইমাম হাকিম নিশাপুরী (ওফাত ৪০৫ হি.) বলেন "ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমের নিকটও "সাহাবীদের তাফসীর মারফু হাদিসের ন্যায়।"
ইমাম নববী আশ-শাফেয়ী (ওফাত ৬৭৬ হি.) বলেন– "সাহাবীদের কোরআনের কোন ব্যাখ্যা মারফু হাদিসের ন্যায়।"
বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাতাদা (রা.) ও তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ (রহ.) সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেন যে, আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য হযরত ইমাম আবু জাফর বাকের (রা.) এ

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “আল্লাহ্‌র (ফদ্বল) বা অনুগ্রহ দ্বারা ও রাসূল (দ.) কে বুঝানো হয়েছে।”

ইমাম হাইয়্যান আন্দুলুসী (রহ.) (ওফাত ৭৪৫ হি.) বর্ণনা করেন, “তাবেয়ী হযরত ইমাম দাহ্‌হাক (রহ.) সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন– উক্ত আয়াতে (ফদ্বল) দ্বারা ইলমকে এবং রহমত দ্বারা মুহাম্মদ (দ.) কে বোঝানো হয়েছে।

ইমাম যওজী (রহ.) (ওফাত ৫৯৭ হি.) উক্ত আয়াত সম্পর্কে লিখেন– ফাদ্বলুল্লাহ্‌ দ্বারা ইল্‌ম বা জ্ঞানকে এবং রহমত দ্বারা মুহাম্মদ (দ.)কে বুঝানো হয়েছে যেমনটি তাবেয়ী ইমাম দাহ্‌হাক (রহ.) তার শায়খ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।”

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বলা যায়, “ফাদ্বল” এবং “রহমত” পাওয়ার পর খুশি উদ্‌যাপন করার জন্য উপরে উল্লেখিত আয়াতে কোরআনুল কারিমের যে নির্দেশ দানের শব্দটি তা “ফাল্‌ ইয়াফরাহু” অর্থাৎ “তারা যেন আনন্দিত হয়” যা “ফারহুন” শব্দ হতে উদগত। সচেতন পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন ফারহুন অর্থ আনন্দিত হওয়া। আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ করেছেন “ফাদ্বল”ও রহমত পেয়ে আনন্দিত হও। আল্লাহ্‌র নির্দেশ এই আনন্দিত হবার দিনকে আবার সূরা মায়েদার ১১০-১১৪নং আয়াতে আল্লাহ্‌ নিজেই নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন এবং ওই নিয়ামত পাওয়ার দিনকে স্মরণ করার নির্দেশও করেছেন। যাকে বনী-ইসরাঈলগণ (থাকুনু লানা ঈদান্‌ লি আওয়ালিনা ওয়া আখারীনি অর্থাৎ “আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ এর জন্য যেন ঈদ হয়ে যায়) মর্মে প্রার্থনা করেন।

শুধু তাই নয় পূর্ববর্তী নবীগণের নিজেদের জন্মদিবস, ওফাত দিবস, বিশেষভাবে আলোচনা করতেন যা রাব্বুল আলামিন কোরআন পাকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন; যেমন ১. এবং শান্তি তাঁরই উপর (তিনি) যে দিন জন্মগ্রহণ করেছেন, যে দিন বেসালপ্রাপ্ত (খোদার সাথে মিলনপ্রাপ্ত) হবেন এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন”। (সূরা মারইয়াম : ১৫)

উপরিউক্ত আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্‌ তা’আলা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.) এর সম্পূর্ণ মিলাদ বর্ণনা করেছেন। আর এর আগে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর বেলাদতের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীও বর্ণনা করেছেন। ২. আল্লাহ্‌ তা’আলা ইরশাদ করেন– এবং শান্তি আমার প্রতি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হবে, আর যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো (সূরা মারইয়াম : ৩৩)।

এ আয়াতে কারিমার আগে আল্লাহ্‌ তা’আলা মরিয়াম (আ.) এর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন; তাঁর গর্ভে নবী হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের কথাও আল্লাহ্‌ তা’আলা জানিয়েছেন। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা’আলা হযরত ঈসা (আ.) এর বাণী উদ্ধৃত করেন যা দ্বারা তিনি নিজের জন্ম ও বেসাল/ওফাতের বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.) হযরত ঈসা (আ.) এর মতো রাসূলে পাক (দ.) নিজের জন্মদিবস নিজেই পালন করেছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, নবী করীম (দ.)কে সোমবার দিন তাঁর রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি উত্তর দেন: এ দিন (সোমবার) আমার বিলাদত (পৃথিবীতে শুভাগমন) হয়েছে এবং এ দিনেই আমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মিশকাত শরিফ, ১৭৯ পৃষ্ঠা)।

রাসূলে পাক (দ.) এর আগমনপূর্ব তাওরাত ইঞ্জিলে তাঁর আগমনীর আলোচনা হতো যা কোরআন পাকে বিদ্যমান এবং হাদিস শরীফেও রয়েছে যেমন: সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৬ স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ.) বলল' "হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ।"

নিয়ামত পাওয়ার দিনগুলোকে স্মরণ করার নির্দেশমূলক আরো কিছু আয়াতে কারিমা নিম্নরূপ:

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন– তাদেরকে (মানুষদেরকে) আল্লাহ্‌র দিনগুলো সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিন। [সূরা ইব্রাহীম, আয়াত-৫] এ আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি এ আহবান জানিয়েছেন যেন তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহ্‌র দিনগুলো সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেন। "আল্লাহ্‌র দিনগুলো" হলো সে সব দিন যাতে বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল বা এমন সব দিন যেগুলোতে আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতি তাঁরই বড় নেয়ামত বর্ষণ করেছিলেন। 'আল্লাহ্‌র দিনগুলোর' ব্যাখ্যার পক্ষে কুরআন মজীদ সাক্ষ্য দেয়, যেখানে হযরত মূসা (আ.)কে উদ্ধৃত করা হয়েছে: "আর যখন মূসা (আ.) আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, স্মরণ করো তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরআউন সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো এবং তোমাদের পুত্রদের যবেহ্ করতো ও তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো; এবং এতে তোমাদের প্রতিপালকের মহান অনুগ্রহ রয়েছে" (সূরা ইব্রাহীম : ৬)।

উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম অনুযায়ী, হযরত মূসা (আ.) এর জাতি যেদিন ফেরআউন হতে মুক্তি লাভ করে সেদিনটি "আল্লাহ্‌র দিন" হিসেবে পরিগণিত হয়েছে; কারণ ওই দিন ছিল তাদের জন্য নেয়ামত বর্ষিত হওয়ার দিন। অথচ তার থেকে বড় "নেয়ামত" স্বরূপ সরকারে দো আলমকে রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে সূরা কলমের দ্বিতীয় আয়াতে ঘোষণা করেছেন, এবং সূরা দোহার ১১ নং আয়াতে ওই নেয়ামত বর্ণনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব মহানবী (দ.) যেদিন এ ধরাধামে শুভাগমন করেন, সেদিনও "আল্লাহ্‌র দিন" হিসেবে বিবেচ্য। কেননা, মহানবী (দ.) অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সারা বিশ্ব জগতকে মুক্ত করে হেদায়াত তথা সঠিক পথের আলোতে নিয়ে এসেছেন। তাই অন্যান্য ঘটনার দিন উদ্‌যাপনের চেয়ে মহানবী (দ.) এর বেলাদত দিবস উদ্‌যাপন অগ্রাধিকার পাবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার রহমত (করুণা) অর্থাৎ বিশ্বনবী (দ.) এর প্রতি শোকরিয়া আদায় করা হবে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে শাস্তি দেবেন যেমনটি তিনি ইরশাদ ফরমান–

এবং স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক শুনিয়ে দিলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে আমি তোমাদেরকে আরও অধিক দেবো, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠোর (সূরা ইব্রাহীম : ৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহগুলোকে স্মরণ করো; এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী হয়ে বিচরণ করো না। [সূরা আ'রাফ : ৭৪]

অতএব, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী আমাদের প্রিয়নবী (দ.)কে স্মরণ করতে হবে; আর মিলাদুন্নবী (দ.) হল স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান: এবং আপনার প্রতিপালকের নেয়ামতের বেশি বেশি আলোচনা তথা প্রচার প্রসার করুন (সূরা দোহা : ১১)।

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 'নেয়ামত' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেন, "আয়াতোল্লিখিত 'নেয়ামত' শব্দটি দ্বারা নবুয়ত ও দ্বীন ইসলামকে বোঝানো হয়েছে" (তাফসীরে ইবনে আব্বাস, সূরা দোহা : ৬৫১)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হচ্ছে নিয়ামত (তিরমিযি)।

ইবনে হিসাম তার সিরাত গ্রন্থে ও ইবনে কাসির আল 'বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবনে ইসহাক বললেন, রবীআ ইবনে নাসরের ইন্তিকালের পর সমগ্র ইয়ামান হাসসান ইবন তুব্বান আসআদ আবু কুরাবের করতলগত হয়। তুব্বান আসআদ ছিলেন সর্বশেষ তুব্বা। ইনি ছিলেন কালকীর ইবন যায়দ, যায়দ ছিলেন সর্বপ্রথম তুব্বা। এই তুব্বা আসআদ আবু কুরাব সেই ব্যক্তি যে মদীনায় এসেছিলেন এবং দু'জন ইহুদী ধর্মযাজককে তার সাথে ইয়ামানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের সংস্কার সাধন ও তাতে সর্বপ্রথম গিলাফ চড়িয়েছিলেন। তার শাসন কাল ছিল রবী'আ ইবুন নাসরের শাসনকালের পূর্বে। পূর্বদেশীয় রাজ্যগুলো জয় করে তিনি মদীনা হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অভিযানের শুরুতেও তিনি মদীনা হয়ে গিয়েছিলেন। মদীনার অধিবাসীদেরকে তিনি উচ্ছেদ করেন নি। তাঁর এক পুত্রকে তিনি তাদের শাসকরূপে রেখে গিয়েছিলেন। গুপ্তঘাতকের হাতে তার ওই পুত্র সেখানে নিহত হন। এ কারণে তিনি মদীনা ধ্বংস, তার অধিবাসীদেরকে উচ্ছেদ এবং উদ্যানরাজি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে মদীনায় ফিরে আসলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিল নাজ্জার বংশীয় আমর ইবন তাশহা।

ইবন ইসহাক বলেন, তুব্বা যখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন বনু কুরায়যা গোত্রের দু'জন ইহুদী ধর্মযাজক তাঁর নিকট আসেন। তারা জেনেছিলেন যে, তুব্বা মদীনা ধ্বংস ও মদীনাবাসীদের মূলোৎপাটনের জন্যে এসেছেন। তারা তাকে বললেন রাজন! আপনি এরূপ করবেন না। এরপরও যদি আপনি আপনার পরিকল্পনা কার্যকর করতে চান তবে আপনি তাতে ব্যর্থ হলে

এবং আপনার উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বললেন, কেন এরূপ হবে? তারা বললেন, কারণ, এই মদীনা হল আখেরী যামানায় এই কুরায়শীয় হারাম শরিফ থেকে আবির্ভূত নবীর হিযরত স্থল। এটি হবে তার বাসস্থান ও অবস্থান স্থল। এতে তুব্বা যুদ্ধ থেকে নিবৃত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই দু'জন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাদের কথা তার খুব ভাল লেগেছে। ফলে, তিনি মদীনাবাসীদের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে বরং সেখানে আখেরী নবী'র (দ.) সম্মানার্থে একটি সুন্দর মহল নির্মাণ করে ওই ধর্মযাজকগণকে তার দায়িত্ব দিয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। যাওয়ার কালে তিনি একটি কবিতা লিখে তাদের কাছে দিলেন এবং বললেন এই পত্রটি আমার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিবেন যদি আমি তাঁকে না পাই। নবী করীম (দ.) থেকে বর্ণিতঃ তোমরা তুব্বাকে গালি দিও না, কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সুহায়লী বলেছেন, বর্ণনাকারী মা'মার হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলাল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, তোমরা আসআদ হিমইয়ারীকে গালি দিও না। কারণ, তিনি সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে গিলাফ চড়ান। সুহায়লী বলেন, যাজকদ্বয় যখন তুব্বাকে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন তিনি কবিতার ছন্দে বলেনঃ

সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি আসআদ
-সৃষ্টিকর্তার রাসূল "আহমদ (দ.)"
ততদিন যদি বেঁচে থাকতাম,
তাঁর উজীর ও সাথী হতাম।
তরবারী দিয়ে বধ করতাম
যতই হতো শত্রু তাঁর,
দূর করতাম দুঃখ যত
জন্ম নিত বক্ষে তাঁর।

বর্ণনাকারী বলেন, বংশানুক্রমে এ কবিতা আনসারদের মধ্যে সুরক্ষিত ছিল। তারা যত্ন সহকারে এটি সংরক্ষণ করতেন। সর্বশেষ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর নিকট এটি সংরক্ষিত ছিল।

সুহায়লী বলেন, ইবন আবি দুনিয়া তার কিতাবুল কুবুরে উল্লেখ করেছেন যে, সান'আ অঞ্চলে একটি কবর খননের পর তাতে দু'জন মহিলার লাশ পাওয়া যায়। তাদের সাথে ছিল একখণ্ড রৌপ্যলিপি। তাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল এ হল তুব্বার দুই কন্যা লামীস ও হিব্বার কবর। তারা সাক্ষ্য দিত যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই, এ বিশ্বাস সহকারে তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকগণ এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খন্ড; মাদারেজুন নবুওয়াত)

রাসূলে পাকের জমানায় ঈদে মিলাদুন্নবী

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হুযুর (দ.) এর পবিত্র মিলাদের বা জন্মের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় নবী করীম (দ.) সেখানে তাশরিফ আনলেন এবং তা দেখে ইরশাদ করলেন, "তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফা'য়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।" (অর্থাৎ সমবেত হয়ে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার ফলে তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত হয়ে গেল।" (ইবনে দাহিয়াহ, আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর, ৭৭ পৃ.)।

হযরত আবু দ্বারদা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হুজুর করীম (দ.) এর সাথে হযরত আমের আনসারি (রা.) এর ঘরে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আমের আনসারি (রা.) তাঁর সন্তান ও স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে নিয়ে মিলাদুন্নবী (দ.) বা হুজুর করিম (দ.) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন– "এই দিনটি, এই দিনটি" তখন হুজুর (দ.) ইরশাদ করলেন, "(হে আমের আনসারী!) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তোমার জন্য রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন। আর ফেরেশ্তাগণ তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করছে। তাছাড়া যারা তোমার মত আমার মিলাদুন্নবী (দ.) বা জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে তারা তোমার মতোই নাজাত লাভ করবে। (ইবনে দাহিয়াহ, আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর, ৭৮ পৃ.)

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত

তিনি বলেন, আমরা নবী (দ.)-এর সঙ্গে এক খানার দা'ওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের বাহু আনা হল, এটা তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিল। তিনি সেখান হতে এক খন্ড খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান? আল্লাহ্ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করবেন? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সবার নিকট পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কি অবস্থায় আছ এবং কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আ.) আছেন। তখন সকলে তাঁর নিকট যাবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ হতে রূহ্ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফেরেশ্তাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজদাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না? আপনি দেখেন না, আমরা কী অবস্থায় আছি এবং কী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। তখন

তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটির কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

তখন আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা আমাকে ছাড়া অন্যের নিকট যাও। তোমরা নূহের নিকট চলে যাও। তখন তারা নূহ্ (আ.)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, হে নূহ্! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ্ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, আমরা কী ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি? আপনি দেখছেন না আমরা কতই না দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতোপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা শেষ নবীর [মুহাম্মাদ (দ.)]-এর নিকট চলে যাও। তখন তারা আমার নিকট আসবে আর আমি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনু 'উবাইদ (রহ.) বলেন, হাদীসের সকল অংশ মুখস্ত করতে পারিনি। (বুখারী শরিফ : ৩৩৪০)

সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত হুজুর পাক (দ.) এর উসিলা/মাধ্যম ছাড়া কোনো সৃষ্টি পার পাবে না। তিনি নেয়ামত বৈ কি হতে পারেন।

মহান রব ইরশাদ করেন – "যারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে কুফুরী বশতঃ পরিবর্তন করেছে।" রাসূল (দ.) কে আল্লাহ্ এ আয়াতে নেয়ামত বলেছেন; আর নেয়ামতকে অস্বীকার করেছেন কারা সে সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেছেন– "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা আল্লাহ্র নেয়ামত (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) কুফুরী বশতঃ পরিবর্তন করেছে তারা হলেন মক্কার কুরাইশ গোত্রের কাফিরগণ।" সুতরাং যারা কুরআনে ঘোষিত হওয়ার পর রাসূল (দ.) কে "আল্লাহ্র রহমত/অনুগ্রহ" স্বীকার করতে চান না তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত।

ঐদিন মুসলমানগণ সাধারণত রাসূলে পাকের (দ.) আগমনের ঘটনাসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনার মাধ্যমে উম্মতকে উৎসাহিত করেন হুজুর পাক (দ)'র প্রেম ভালোবাসার প্রতি।
যেমন বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (রহ.) এর দাদা ওস্তাদ ইমাম আব্দুর রাযাক (ওফাত. ২১১হি.) রাসূল (দ.)-এর মিলাদ বা সৃষ্টি সম্পর্কে একটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে– "হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (দ.)কে আরজ করলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল (দ.) আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আমাকে কি আপনি অবহিত করবেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কোন বস্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে রাসূলে কারীম (দ.) ইরশাদ করেন– হে জাবির! সমস্ত

বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তোমার নবীর নূরকে তাঁর আপন নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় ওই নূর কুদরতে যেথায় সেথায় ভ্রমণ করছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেশ্‌ত-দোজখ, ফেরেশ্‌তা, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, জিন-ইনসান কিছুই ছিল না।" এ হাদীসে রাসূল (দ.) তাঁর শুভাগমনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা আলোকপাত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর সংকলিত 'সুনানে তিরমিযী' শরীফে একটি অধ্যায়ের মধ্যে "মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করেছেন এবং এতে হুজুর (দ.)এর জন্ম তারিখ নিয়ে আলোচনা সম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হলো– হযরত মোত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আপন দাদা কায়েস বিন মোখরামা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, আমি ও নবী করীম (দ.) 'আমুল ফীল' অর্থাৎ, বাদশা আবরাহার হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহ্‌র গজব নাজিল হওয়ার বছর জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) বনি ইয়ামার ইবনে লাইস এর ভাই কুবাছ ইবনে আশইয়ামকে বললেন– 'আপনি বড় না রাসূল (দ.)? তখন তিনি বললেন, রাসুল (দ.) আমার চেয়ে অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে, আর আমি জন্মসূত্রে রাসূল (দ.) এর আগে মাত্র।" এ হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযি (রহ.) 'হাসান' বলেছেন। এ হাদিস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো (১) সাহাবীদের যুগে বিভিন্ন স্থানে মিলাদুন্নবী (দ.)-এর আলোকপাত হত (২) আর যারা বলেন মিলাদুন্নবী (দ.) বলতে কোন কথা কোরআন হাদীসে নেই ইমাম তিরমিযি (রহ.) তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন মিলাদুন্নবী (দ.) অধ্যায় রচনা করে। নিম্নের এ হাদিসে নবীজি নিজেই তাঁর মিলাদুন্নবী (দ.) এর আলোচনা করেছেন।

"হযরত ইরাবাদ বিন ছারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম (দ.) হতে বর্ণনা করেন... আমি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া হযরত ঈসা (আ.) এর সুসংবাদ। আমার মাতা যখন আমাকে প্রসব করলেন তখন যে নূর বের হয়েছিল তাতে শাম দেশের কোঠা তিনি দেখতে পেয়েছেন। আমি সেই স্বপ্ন বা দৃশ্য।" এ হাদিসটিকে শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানী স্বয়ং সহিহ্ বলেছেন। এ হাদিসটি অসংখ্য সনদে বর্ণিত আছে।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আসলেন। কারণ তিনি যেন হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ বুনিয়াদ সম্পর্কে বিরূপ কিছু মন্তব্য করেছেন। (তা হুজুর কারীম (দ.)কে অবহিত করলেন।) তখন হুজুর (দ.) মিম্বর শরীফের উপর আরোহন করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবা কেরামগণের উদ্দেশ্যে বললেন "আমি কে?" উত্তরে তাঁরা বললেন "আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল"। তখন হুজুর আকরাম (দ.) ইরশাদ করলেন "আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র মুহাম্মদ (দ.)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব-দানব সবই সৃষ্টি করেছেন। এতেও আমাকে উত্তম পক্ষের (অর্থাৎ মানবজাতি) মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের (মানবজাতি) কে দু'সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন (অর্থাৎ আরবীয় ও অনারবীয়) এতেও আমাকে উত্তম

দু'সম্প্রদায়ে (আরবী) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরব জাতিকে অনেক গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে গোত্রের দিক দিয়ে উত্তম গোত্রে (কুরাইশ) এ রেখেছেন। তারপর তাদেরকে (কুরাইশ) বিভিন্ন উপগোত্রে ভাগ করেছেন। আর আমাকে উপগোত্রের দিক দিয়ে উত্তম উপগোত্রে (বনি হাশেম) সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে সত্তাগত, বংশগত ও গোত্রগত দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।" ইমাম তিরমিযি এ সনদটিকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হুযুর (দ.) এর পবিত্র মিলাদের বা জন্মের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় নবী করীম (দ.) সেখানে তাশরিফ আনলেন এবং তা দেখে ইরশাদ করলেন– "তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফা'য়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।" (অর্থাৎ সমবেত হয়ে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার ফলে তোমাদের জন্য দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত হয়ে গেল।" (ইবনে দাহিয়াহ, আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর, ৭৭ পৃ.)।

"হযরত আবু দ্বারদা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হুজুর করীম (দ.) এর সাথে হযরত আমের আনসারী (রা.) এর ঘরে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আমের আনসারী (রা.) তাঁর সন্তান ও স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে নিয়ে মিলাদুন্নবী (দ.) বা হুজুর করিম (দ.)এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন– "এই দিনটি, এই দিনটি" তখন হুজুর (দ.) ইরশাদ করলেন– "(হে আমের আনসারী!) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন। আর ফেরেশ্তাগণ তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করছে। তাছাড়া যারা তোমার মত আমার মিলাদুন্নবী (দ.) বা জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে তারা তোমার মতোই নাজাত লাভ করবে। (ইবনে দাহিয়াহ, আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর, ৭৮ পৃ.)

আবু সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (কেয়ামতের দিন) নূহ্ এবং তাঁর উম্মত (আল্লাহ্র দরবারে) হাযির হবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার বাণী) পৌঁছিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার রব! তখন আল্লাহ্ তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ্ কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়েছেন। তারা বলবে, না, আমাদের নিকট কোন নবীই আসেননি। তখন আল্লাহ্ নূহ্কে বলবেন, তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (দ.) এবং তাঁর উম্মত। [রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বললেন] তখন আমরা সাক্ষ্য দিব। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর এটিই হল মহান আল্লাহ্র বাণীঃ আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত করেছি, যেন তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও। (আল-বাক্বারাহ ১৪৩) --- অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হও। হাদিস (বুখারী ৩৪৩৯)

এই পবিত্র মিলাদুন্নবী (দ.) সম্পর্কে রাসূলে পাক (দ.) এর সাহাবা কেরাম এবং তাবেঈনগণের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা গেলঃ

১. হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "যে ব্যক্তি হুজুর পাক (দ.) এর মিলাদ শরিফ পাঠ বা মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে এক দিরহাম ব্যয় করবে সে জান্নাতে আমার বন্ধু হয়ে থাকবে"।

২. হযরত উমর (রা.) বলেন, "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিশেষ মর্যাদা দিল সে মূলতঃ ইসলামকেই পুনরুজ্জীবিত করল।

৩. হযরত উসমান (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে এক দিরহাম খরচ করল সে যেন বদর ও হুনায়েন যুদ্ধে শরিক থাকল।

৪. হযরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করল সে ব্যক্তি অবশ্যই ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, (পৃষ্ঠা নং৮/৯)।
দ্রষ্টব্যঃ ইমাম ইউসুফ নাবাহানী তার জাওয়াহিরুল বিহার কিতাবের তৃতীয় খন্ড ৩৫০ পৃষ্ঠায় উপরোল্লিখিত হাদিসগুলোর সনদ সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেনঃ
"আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে, আমার যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকতো তাহলে তা মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে ব্যয় করতাম"।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এ উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছে, সে ঈমানের সফলতা লাভ করেছে।

হযরত মারুফ কারখী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষে পানাহারের আয়োজন করে মুসলিম ভাইদের একত্রিত করে, আলোকসজ্জা করে, নতুন পোশাক পরিধান করে এবং খুশ্‌বো, আতর, গোলাপ ও লোবান প্রয়োগে নিজেকে সুগন্ধিযুক্ত করে; রোজ কিয়ামতে প্রথম শ্রেণির নবীদের সাথে তার হাশর হবে এবং ইল্লীঈনের সর্বোচ্চ স্থানে সে অবস্থান করবে।

শাফেঈ মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে মুসলিম ভাইদেরকে খাবার তৈরী করে মজলিসে আপ্যায়ন করে ও ইবাদাত সম্পন্ন করে, রোজ কিয়ামতে সিদ্দীকিন, শোহাদা ও সালেহীনদের সাথে তার হাশর হবে এবং জান্নাতুন নাঈমে সে অবস্থান করবে। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং ১১-১৩)

উলামায়ে উম্মতের কওল ও আমল

০১. মুহাদ্দিস ইবনে যওজী (রহ.) {ওফাত. ৫৯৭ হি.} বলেন, "মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, শাম ও তামাম ইসলামী বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমাবাসীরা সবসময় হুযুর (দ.) এর বেলাদাত শরীফের ঘটনায় মিলাদ মাহফিল আয়োজন করতেন। তারা রবিউল আওয়াল মাসের নতুন চাঁদ উদিত হলে খুশি হয়ে যেত এবং হুজুরের মিলাদ শোনার ব্যাপারেও সীমাহীন গুরুত্বারোপ করতো। আর মুসলমানগণ এসব মাহফিল কায়েম করে পরিপূর্ণ প্রতিদান ও আধ্যাত্মিক কামিয়াবি হাসিল করত।

০২. ইমামুল হাফেজ সাখাভী (রহ.) বলেন– "বিশ্বের চতুর্দিকে ও শহরগুলোতে হুজুর (দ.) এর আগমনের মাসে মুসলমানরা বড় বড় আনন্দানুষ্ঠান করে থাকে।"

০৩. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রহ.) বলেন, "আমার মতে মিলাদের জন্য সমাবেশ করা, তেলাওয়াতে কোরআন, হুযুর (দ.)'র পবিত্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং আগমনকালীন গঠিত নানান আলামত সমূহের আলোচনা করা এমন বেদাতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত; যে সব কাজের সওয়াব দেয়া হয়। কেননা এতে হুজুর (দ.) এর তা'জিম, মোহাব্বাত এবং তাঁর আগমনের খুশি জাহির করা হয়।

০৪. ইমাম হাফেজ ইবনে হাজর মক্কী (রহ.) বলেন, "আমাদের এখানে মিলাদ মাহফিল জিকর-আজকার যা-কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তার অধিকাংশই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সাদকা করা, জিকির করা, দরুদ পড়া, ও রাসূলে পাক (দ.) এর উপর সালাম পেশ করা।

০৫. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম কুস্তালানী (রহ.) লিখেন, "প্রতিটি যুগে মুসলমানগণ নবী করীম (দ.) এর বেলাদাত শরিফের মাসে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে আসছে, উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাদক্বাহ খায়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পূণ্যময় কাজ বেশি পরিমাণে করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে আল্লাহ্‌র অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়।"

০৬. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, "মুসলমানগণ প্রতি নববর্ষে মাহফিল করে আসছেন এবং তাঁরা মিলাদ পাঠের আয়োজন করেন, এর ফলে তাদের প্রতি অসীম রহমত এর প্রকাশ ঘটে।"

০৭. তাফসীরে রুহুল বয়ান প্রণেতা আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) বলেন, "মিলাদ শরিফ করাটা হুজুর (দ.) এর প্রতি সম্মান, যদি এটা মন্দ কথা বার্তা থেকে মুক্ত হয়। ইমাম সূয়ূতী (রহ.) বলেন, হুজুর (দ.) এর বেলাদাতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।"

০৮. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) বলেন, "হুযুর (দ.) এর পবিত্র বেলাদাতের মাসে মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সর্বদাই পালিত হয়ে আসছে। ঐ মাসের রাত্রিতে দান-সদকা করা, আনন্দ প্রকাশ করা এবং ঐ স্থানে বিশেষভাবে নবীর আগমনের উপর প্রকাশিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করা মুসলমানদের বিশেষ আমল সমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

০৯. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) বলেন, “মক্কা মোয়াজ্জমায় হুজুর (দ.) এর বেলাদত শরীফের দিন আমি এমন একটি মিলাদ মাহফিলে শরীক হয়েছিলাম, যাতে লোকেরা হুজুরের দরগাহে দরূদ-সালাতের হাদিয়া পেশ করছিল।”
১০. অন্যত্র তিনি স্বীয় পিতা হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম দেহলভী (রহ.) এর সূত্রে উল্লেখ করে বলেন, “আমি প্রতি বছর হুযুর (দ.) এর মিলাদ মাহফিলে খানার ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু এক বছর আমি খাবার যোগাড় করতে পারিনি। তবে কিছু ভুনা করা চনাবুট পেয়েছিলাম। অতঃপর আমি তা মিলাদে আগত মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম। পরে আমি স্বপ্নে হুজুর (দ.) কে বড়ই খোশ হাসেল তাশরিফ আনতে দেখলাম এবং তাঁর সামনে মওজুদ রয়েছে উক্ত চনাবুট (যা আমি বণ্টন করেছিলাম)।”
১১. হযরত ইবনে তাইমিয়া বলেন, “আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করছি যে মিলাদকে মানুষেরা মৌসুমীভাবে পালন করে তা’জিম করে থাকে, এতে তাদের অনেক সাওয়াব হবে। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কিছু লোক এটাকে হাসান মনে করে, কারণ সঠিক মু’মিন ব্যক্তি মন্দ কাজ করে না।”
১২. হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) বলেন, “আমাদের আলেমগণ মওলুদ শরিফ নিয়ে অনেক ঝগড়া করে থাকে। এরপরেও আলেমগণ কিন্তু জায়েযের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। যখন জায়েযের সুরত রয়েছে, তো এত বাড়াবাড়ির কি প্রয়োজন। আমাদের জন্য হারামাঈনের অনুসরণ করাই যথেষ্ট।”
হযরত হাজী সাহেব (রহ.) ‘ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়ালা’ গ্রন্থে নিজের আমলও বর্ণনা করে দিয়েছেন, “এই ফকীরের নিয়ম হলো এই যে, আমি মওলুদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করি, এমনকি বরকতের ওসিলা মনে করে প্রতি বছর উক্ত অনুষ্ঠান করে থাকি এবং কিয়ামের মধ্যে লুত্ফ (ভালবাসা) ও লাজ্জাত (স্বাদ) পেয়ে থাকি।”

ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) লাইলাতুল ক্বদর হতে উত্তম

বিশ্ব বিখ্যাত ফকীহ্ ইমাম তাহাবী (রহ.) ইমাম শাওয়াফে (রহ.) এর কওল নকল করে লিখেন, “নিশ্চয়ই ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাত হলো ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর রাত বা রাসূল (দ.) এর শুভাগমনের রাত্র (১২ই রবিউল আওয়াল) তারপর হল শবে কদরের রাত্র।” ইমাম শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (রহ.) লিখেন– “শবে ক্বদর হতে মিলাদুন্নবী (দ.) এর রাত উত্তম।” ইমাম কুস্তালানী (রহ.) ও অনুরূপ বলেছেন এবং এর তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। (মা সাবাতা বিস সুন্না মাদরেজুন্নাবুয়ত।)
‘আল-হাওয়ী লিল্ ফাত্ওয়া’ কিতাবে মিলাদুন্নবী (দ.) এর স্বপক্ষে ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ুতী (রহ.) এর ভাষার মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন যা মূলতঃ মানুষদের সমবেত করা, কুরআনের অংশ-বিশেষ তেলাওয়াত, মহানবী (দ.)-এর ধরাধামে শুভাগমন (বেলাদত) সংক্রান্ত ঘটনা ও লক্ষ্মণগুলোর বর্ণনা পেশ, অতঃপর তাবার্‌রুক (খাবার) বিতরণ এবং সবশেষে সমাবেশ ত্যাগ, তা উত্তম বেদআত (উদ্ভাবন); আর যে ব্যক্তি এর অনুশীলন করেন

তিনি সওয়াব অর্জন করেন, কেননা এতে জড়িত রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর মহান মর্যাদার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর সম্মানিত বেলাদতের প্রতি খুশি প্রকাশ। –ইমাম সুয়ুতী কৃত 'আল-হাওয়ী লিল্ ফাতাওয়ী', ১ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, (মাকতাবা আল-আসরিয়া, বৈরুত, লেবানন হতে প্রকাশিত)

"আল উয়াছায়েল ফী শরহিশ শামাইল" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "গৃহে বা মসজিদে কিংবা মহল্লায় মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে হুযুর (দ.)-এর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তখন অবশ্যই সে গৃহ বা মসজিদ বা মহল্লা অসংখ্য ফেরেশ্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং উক্ত স্থানসমূহে যারা অবস্থান করে তাদের জন্য তারা সালাত পাঠ করে, অর্থাৎ তাদের গুণাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সবাইকে সাধারণভাবে রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর নূরের মালা পরিহিত ফেরেশ্তাকুল বিশেষতঃ হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল, ঈস্রাফিল ও আজরাঈল (আ.) মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে মাহফিল আয়োজনকারীর গুণাহ্ মাফের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। তিনি আরো বলেন, যে মুসলমানের গৃহে হুযুর (দ.) এর মিলাদ পাঠ করা হয়, সে গৃহ এবং গৃহে বসবাসকারী ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নি, পানি, পরনিন্দা, কুদৃষ্টি ও চুরি ইত্যাদির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে। সে ঘরে যার মৃত্যু হবে সে মৃত ব্যক্তি কবরে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর অতি সহজে দিতে পারবে। যে ব্যক্তি রাসূল (দ.) এর মিলাদ কে সম্মান করতে চায়, তার জন্য এটাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির নিকট নবী করীম (দ.) এর মিলাদের কোন মর্যাদা নেই, তার অন্তর এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে, তার সামনে হুযুর পুরনূর (দ.)-এর বিশ্বজোড়া প্রশংসাগীতি উচ্চারিত হলেও তার অন্তরে হুযুর (দ.)-এর জন্য বিন্দুমাত্র মোহাব্বতের উদ্রেক হবে না। –আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং-১৩ ও ১৪।

বুখারী শরীফের ব্যাখাকার বিশ্ববিখ্যাত মোহাদ্দিস আল্লামা কুসতলানী (রহ.) আলাইহি (ইন্তিকাল: ৯২৩ হিজরী) বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (দ.)-এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাতসমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করেন। আর উক্ত রাতকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করবে এ জন্য যে, যাদের অন্তরে (নবী বিদ্বেষী) রোগ রয়েছে, তাদের ঐ রোগ যেন আরো শক্ত আকার ধারণ করে এবং যন্ত্রণায় অন্তর জ্বলে পুড়ে যায়। – শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২৬২।

বুখারী শরীফের আরেক অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' এর লেখক ইমাম ইবন হাজর আসকালানী (দ.) বলেন, মহানবী (দ.)-এর মিলাদ দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কে হযরত ইমামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি লিখিতভাবে যে উত্তর দেন তা নিম্নরূপ: মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনের উৎস বলতে এটি এমন এক বেদআত (উদ্ভাবন) যা প্রথম তিন শতকের সালাফ আস্ সালেহীন (পুণ্যাত্মাবৃন্দ) কর্তৃক আমাদেরকে জ্ঞাত করানো হয়নি, যদিও এতে প্রশংসনীয় ও প্রশংসনীয় নয় উভয় দিকই বিদ্যমান। কেউ প্রশংসনীয় দিকগুলো গ্রহণ করে প্রশংসনীয় নয় এমন দিকগুলো বর্জন করায় যত্নবান হলে তা বেদআতে হাসানা তথা

কল্যাণময় নতুন প্রথা হবে। আর তা না হলে এর উল্টো হবে। এ বিষয়ের বৈধতা প্রতীয়মানকারী একটি নির্ভরযোগ্য শরীয়তের দলিল আমার সামনে এসেছে, আর তা হলো বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত সহীহ হাদিস যা'তে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী (দ.) মদীনা মুনাওয়ারায় হিযরত করে দেখতে পান সেখানকার ইহুদীরা ১০ই মহররম (আশুরা) তারিখে রোযা রাখেন (হুসনুল মাকসাদ ফী আমলিল মওলিদ, ৬৩ পৃষ্ঠা)।

মৌলভী আশরাফ আলী থানভী কোনো এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন, প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের ব্যাপারে সাধকদের আমলকে আমি ভিত্তিহীন মনে করিনা। শাফেয়ী মাযহাবের মুযতাহিদ বা গবেষক ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের অভিমত এটাই। আল্লামা ইমাম শামী (রহ.) তাঁর প্রডুত কিতাবের মুসাফাহা বা'দাস সালাত অধ্যায়ে শায়েখ আবু জাকারিয়া মহিউদ্দিন নববী (রহ.) এর অনুরুপ অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই যেসব সুফিয়ায়ে কেরাম বিশুদ্ধ পন্থায় মিলাদ মাহফিল করেন, তাদের ব্যাপারে আপত্তিমুলক খারাপ ধারণা না করাই উচিত। (মাযালিসে হাকিমুল উম্মত)

মৌলভী আশরাফ আলী থানবী, মৌলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলভী কাসেম নানুতুবি সাহেব প্রমুখ দেওবন্দি বড় বড় আলেমদের পীর ছিলেন হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মাক্কী (রহ.) যিনি মিলাদ কিয়ামের পক্ষে ছিলেন। যখন অনেকেই তাঁকে বেদাতি বলে ফতোয়া দিতে লাগলেন তখন মৌলভী আশরাফ আলী থানবি নিজের পীর এর পক্ষে কলম ধরলেন। তিনি বলেন, হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মাক্কী (রহ.) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবিকল আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এসব আমল তথা প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম অনুষ্ঠানে যোগদান, বক্তব্য ও লেখনির মাধ্যমে তা সমর্থন করা কোনো ভ্রান্ত আকীদা বা শিয়া অনুসারীদের অনুকরণ ছিলনা। বরং এহেন মহৎ আমলগুলা যেহেতু মূলত বৈধ, তাই তিনি বৈধ কাজকে পুণ্যময় মনে করে নিজে করতেন এবং অপরকে করতে উৎসাহ যোগাতেন। (এমদাদুল ফতোয়া)

মৌলভী আশরাফ আলী থানভী উক্ত বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় আরো বলেন, আমাদের আলেমগণ প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম নিয়ে অনেক ঝগড়া বিভেদে লিপ্ত রয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমরা মিলাদ ও কিয়ামকে বৈধ বা 'পুণ্যময় আমল' মনে করি।

মৌলভী আব্দুল হাই লখনভী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত দেওবন্দি আলেম। তিনি তাঁর মযমুয়ায়ে ফতোয়া কিতাবের ২য় খণ্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, মিলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনার সময় যদি কোনো ব্যক্তি সত্যিকারের ইশকে মোহাব্বাতে লৌকিকতা বিহীন কিয়াম বা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে কিছু বলার নেই।

ঈদে মিলাদুন্নবী'র খুশি উদযাপনের পাশাপাশি সমাজের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকা

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দেন–
'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশ্‌তাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মোহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার (সূরা বাক্বারা : ১৭৭)।'

রাসূলে পাকের (দ.) জীবনাদর্শ অনন্তকাল সমুজ্জ্বল রাখতে এই খুশি উদযাপনের দিনে বিত্তবানগণ সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি অকাতরে সহায়তার হাত প্রসারিত করতে পারেন। অস্থিতিশীল বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার শান্তি আনয়নকল্পে ধনসাম্যতার নিমিত্ত তহবিল গঠনের মাধ্যমে সমাজের ছোটবড় সকল অভাব-অভিযোগ বিমোচনে কাজ করা। যথা– সুবিধাবঞ্চিত পরিবার চিহ্নিত করে কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবককে বিবাহ সহায়তা, বাস্তুহারাকে গৃহনির্মাণে সহায়তা, চিকিৎসা খাতে আর্থিক সহায়তা, দক্ষ নারী উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা, সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা, ঋণ পরিশোধে আর্থিক সহায়তা, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের দিকে এগিয়ে নিতে যেতে কর্মক্ষম উদ্যোগী ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা উত্তরণে সহায়তা – এক কথায় মানব জীবনের পাঁচটি মৌলিক অধিকার– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে রাসূলে পাকের নির্দেশিত আধুনিক ধর্মীয় সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বুখারী শরিফ ও মুসলিম শরীফের দুইটি হাদিস শরিফ দিয়ে সমাপ্ত করিঃ
হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হই। (আল বুখারী, কিতাবুল ঈমান ১৪-১৫)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিতঃ
আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই। (আল বুখারী ও মুসলিম, মাসনাদে ইমাম আহমাদ)
৬৩ বছর হায়াতে বসরীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কৃতিত্ব এবং সংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করাও প্রয়োজন মনে করি। প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানেই নবীজির বারগাহে রিসালতে ফরিয়াদি হয়ে ইতি টানলাম।

আমার যেতে স্পৃহা হয়
সেই মরু মদিনায়,
অর্থ-বিত্ত নেই গো আমার
তাই আজি নিরুপায়।
শুনিনু কভু এমন রাজ্য
আছে এই মেদ্বীনী মাঝে,
সাজানো-গোছানো করিলে স্রষ্টা
নিত্য সুশ্রী সাজে।
বলিতে বাধ্য সেই রাজ্যের
নৃপতি বানালেন কাকে,
১২ই রবিউল আওয়াল ধরণীতে
প্রেরিলেন প্রভু যাকে।
তিনি ভূ-পতি যিনি
বিশ্ব আঁধার করিলেন দূর,
করিলেন এই ক্ষিতিকে এতই
মানুষের লাগি সুমধুর।
আগমনে তাঁর পুলকিত আজ
প্রভুর সৃজন সবি,
তাইতো মানুষ হর্ষমনে
করে মিলাদুন্নবী (দ.)।।

অতএব, আল্লাহ্পাক আমাদেরকে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র ভালোবাসায় উজ্জীবিত করুণ। আমিন, বিহুরমাতে সাইয়েদুল মুরসালিন!

লেখক: গবেষক, মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.) ও আহমদ মুজতবা (দ.) মোবারক নামদ্বয়ের তাৎপর্য এবং সংস্কারসমূহ

আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী

বলুনঃ আল্লাহ্ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। (সূরা বনী-ইসরাঈল : ১১০)

"আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে"। (সূরা আল আরাফ : ১৮০)

'মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)'

হযরত 'মুহাম্মদ মুস্তফা' (দ.)– এখানে দুটি শব্দ, একটি 'মুহাম্মদ' এবং অপরটি 'মুস্তফা'। একটি হুজুর (দ.) এর পবিত্র নাম, অপরটি সিফাত বা বিশেষণ। হুজুর (দ.) এর জাতি নাম 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' একই মূল অক্ষর (হা-মিম-দাল) হতেই উদ্গত। 'আল্লাহু' লিখতে পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার হয়, যেমন– আলিফ, লাম, লাম, আলিফ এবং হা। অপরদিকে 'মুহাম্মদ' (দ.) লিখতেও পাঁচ অক্ষরের ব্যবহার হয়, যথা– মিম, হা, মিম, মিম এবং দাল। পবিত্র কুরআনে চারবার 'মুহাম্মদ' ও একবার 'আহমদ' এসেছে হয়ত এই পাঁচের সাথে মিল রেখেই। আয়াতে কারিমাগুলো হলো–

১. 'আর মুহাম্মদ (দ.) একজন রাসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্র কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাদের সওয়াব দান করবেন' (সূরা আলে-ইমরান : ১৪৪)।

২. 'মুহাম্মদ (দ.) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত' (সূরা আহযাব : ৪০)।

৩. 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে **মুহাম্মদ (দ.)** এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন' (সূরা মুহাম্মদ : ২)।

৪. 'মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা

এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভুত করে, যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন' (সূরা ফাতাহ্ : ২৯)।

৫. 'আমি এমন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহম্মদ' (সূরা সাফ্ফ : ৬)।

'মুহাম্মদ' (দ.) নাম এর শব্দগত ব্যাখ্যা

মুহাম্মদ শব্দটি 'হামদ' শব্দ হতে নির্গত মূল অর্থ; 'প্রশংসা'। ইমাম সোহাইলী বলেন, এটা 'মফউল', যার অর্থ– তিনি ঐ জাতে পাক যার প্রশংসা বার বার করা যায় (আল আরদুল আন্ফ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮)। ইমাম রাগেব ইস্পাহানি বলেন, 'মুহাম্মদ' তাঁকে বলে যার উপর্যুক্ত প্রসংসা সীমারেখার ঊর্ধ্বে (আল মুফরাদাত, পৃঃ ১৩১)।

রাব্বুল আলামীন এর জাতি নাম আল্লাহু শব্দ হতে 'আলিফ' বাদ দিলে 'লিল্লাহ্' হয় যার অর্থ আল্লাহ্ জন্য। 'লাম' বাদ দিলে হবে 'ইলাহ' যার অর্থ আল্লাহ্। যদি লাম এবং আলিফ দুইটি বাদ দেওয়া হয় তবে শব্দটি হবে 'লাহু' যার অর্থ তাঁর জন্য। যদি শেষ অক্ষর বাকী রেখে সব অক্ষর বাদ দেয়া হয় তবুও হবে 'হু' অর্থ: 'সে/ তিনি'। একই প্রক্রিয়ায় 'মুহাম্মদ' শব্দটি আঁকা মাওলার (দ.) জাতি নাম। যার 'মীম' বাদ দিলে থাকে 'হামদ' যার অর্থ প্রশংসা। প্রথম মিম ও হা বাদ দিলে বাকী থাকে 'মিম' ও 'দাল' তাথা 'মদ', যার অর্থ:-লম্বা/উচ্চ স্বর। যদি সামনের ৩ হরফ বাদ দিয়ে বাকী থাকে 'দাল' যার অর্থ দলিল বা প্রমাণ। অর্থাৎ 'আল্লাহ' ও 'মোহাম্মদ' উভয় নামের মিল হলো মূল অক্ষরগুলো কোন একটি বা একাধিক বাদ দিলেও তা পূর্ণ অর্থবোধক শব্দ হয়। 'মোহাম্মদ' নামে 'আল্লাহ্' এর অযুদ ও ওয়াহদানিয়াতের প্রমাণ এটাই। মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন–

"লিবাসে আবুল বশর পুশিদা মসজূদে মলক গস্তম/ বতছবীরে মুহাম্মদ, হামেদ ওয়া মাহমুদ বদশ্তম।"

অর্থাৎ– মনুষ্য পিতার পোশাকে ফেরেশ্তাগণের মসজূদ যিনি / মোহাম্মদ আকৃতিতে প্রশংসাকারী ও প্রশংসাকৃত সর্বই তিনি। (মসনবী)

ইবনে আদী বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা মোহাম্মদ (দ.) নামটি আপন শানে জালালী প্রকাশের জন্য আপন জাতি নাম হতে বের করেন। আরশে আযিমে আল্লাহ্ 'মাহমুদ' আর হুজুর পুরনূর (দ.) 'মুহাম্মদ' (আল কামিল, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৯৭)। তাই আল্লাহ্ সর্বদা ঐ নামেই তো প্রসংশা করেন (সূরা আহযাব : ৫৬)। 'হক্ক' এবং 'খাল্ক' তথা স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যমনি তিনি। তাই তো তিনি– 'জাওয়ামিউ কালামে ইলাহী'।

হুজুর (দ.) এর নাম মোবারক– 'হামদ' শব্দ হতে কেন নির্গত হওয়ার কারণ হলো– 'হামদ' বা সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহ্ জন্য। যেমন– 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য); 'সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্'। আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য' বলে' (সূরা ইউনুস : ১০)'। যে প্রশংসা করে তাঁকে বলে– 'হামেদ' বা প্রশংসাকারী, আর যাঁর প্রশংসা করা হয় তাঁকে বলে– 'মাহমুদ' বা প্রশংসাকৃত। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালাই প্রশংসা করছেন তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর। তাই তো বর্ণিত আছে, 'মুহাম্মদের (দ.) আকৃতিতে যখন খোদার তজল্লী হল তখন মুহাম্মদ (দ.) কোথায় ছিলেন? খোদাকে মুহাম্মদ (দ.) হতে বিচ্ছিন্ন মনে করো না। (গঞ্জেরাজে মসনবী, আব্দুর রহমান ফতেহাবাদী, ৭ম খন্ড, পৃ: ৪)। আল্লাহ্ তায়ালা নিজের নামের আগে তার মাহবুব (দ.) এর নাম রেখেছেন (রূহুল বয়ান, ৯ খন্ড, পৃ.৪৯৯)।

'মুস্তফা' এর শব্দগত ব্যাখ্যা

শব্দটি 'এস্তাফা' থেকে যার অর্থ "মনোনীত" কুরআনে কারিমে এই অর্থে 'এস্তেফা' শব্দটি অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। যেমন–

১. আর যখন ফেরেশ্তা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ আপনাকে মনোনীত করেছেন– (আল ইমরান : ৪২)।
২. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদম (আ.), নূহ্ (আ.) ও ইব্রাহীম (আ.) এর বংশধর এবং ইমরানের খান্দনকে মনোনীত করেছেন (আল ইমরান : ৩৩)।
৩. অতঃপর আমি (আল্লাহ্) কিতাব দিয়েছি যাকে মনোনীত করেছি আমার বান্দাদের হতে (ফাতির : ৩২)।
৪. বলুন; সকল প্রসংশা আল্লাহ্রই এবং শান্তি তাঁর ঐ বান্দাগণের উপর, যারা 'মনোনীত' (সূরা নামাল : ৫৯)।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে 'এস্তফা' শব্দের 'মনোনীত' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'মুস্তফা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মকবুল তথা নির্বাচিত, সম্মানিত অর্থাৎ মানবীয় সকল খারাপ দিকসমূহ হতে পাক-পবিত্র। তিনি ঐ সত্ত্বা যিনি মানব খায়সিয়তে সকল অপবিত্রতা হতে মুক্ত (লোগাতুল মানজেদ)।

'আহমদ মুজতাবা' (দ.)

'আমি এমন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহম্মদ' (সূরা সাফ্ফ : ৬)।

হযরত মোতইম (রহ.) বলেন রাসূল পাক (দ.) ইরশাদ করেছেন, 'আমার পাঁচটি নাম আছে আমি 'মুহাম্মদ', আমি 'আহমদ', আমি 'আল মাহী', আমা দ্বারা আল্লাহ্ কুফর দূর করবেন, আমি 'হাশের'– লোকের হাশর হবে আমার কদমের উপর।' সহিহ্ বুখারীর অপর

রেওয়ায়েতে '৫' শব্দটি নাই, 'আমি আকেব' শব্দটি আছে। (সহিহ্ বুখারী; সহিহ্ মুসলিম; মোয়াত্তা)

'আহমদ' শব্দটি কখনো অধিকতর প্রশংসাকারী অর্থে আবার কখনো অধিকতর প্রশংসিত অর্থ ব্যবহার হয় (তাফসিরে কবির)। 'আহমদ' 'হামদ' শব্দ হতে নির্গত যার শাব্দিক অর্থ 'প্রশংসা'। আর 'আহমদ' অর্থ আমি প্রশংসা করছি। এটা যখন বান্দা বলেন, তখন হয় 'আল হামদু' বা 'সমস্ত প্রশংশা'। বান্দা তো তার মাবুদেরই প্রশংসা করে। তাই সম্বোন্ধটা আল্লাহ্ দিকেই করে বলে 'লিল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ জন্য। আর যখন আল্লাহ্ নিজেই প্রশংসাকারী হন তখন তাঁর প্রিয় বন্ধু বা হাবীবেরই তো প্রশংসা করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহ্ ঈসা (আ.) এর উপর ওহী নাযিল করলেন; যদি আমি মুহাম্মদকে (দ.) সৃষ্টি না করতাম তবে আদম (আ.)কেও সৃষ্টি করতাম না (আল ওয়াফা বী আহওয়ালে মুস্তফা, ইমাম যুযী)। অন্য রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ (দ.)কে সকল নবীগণের উপর মর্যাদা দিয়েছেন (মিশকাত : ৫১৫)। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (দ.) বলেছেন, আমি-ই-প্রথম মানুষ (মিশকাত : ৫০৯)। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, আদম (আ.) নিষিদ্ধ বৃক্ষ ফল খাওয়ার পর আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা চাইলেন মুহাম্মদ (দ.) এর উসিলায়। আল্লাহ্ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, মুহাম্মদ (দ.) কে? তিনি উত্তর দিলেন, 'হে মাবুদ আপনি আমার সৃষ্টি সম্পূর্ণ করলে আমি প্রথম আরশের দিখে দেখি, আপনার নামে সাথে ঐ 'মুহাম্মদ' নাম লেখা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যদি তাকে সৃষ্টি না করতাম তবে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না (আল ওয়াফা)।

হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূল (দ.) বলেছেন; আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) এর উপর ওহী পাঠালেন হে মুসা তুমি বনী ইসরাইলকে বলে দাও, যে কেউ 'আহমদ'-কে না মানবে আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ্ 'আহমদ' কে? আল্লাহ্ বলেন, আমি অন্য কোন মাখলুক তার থেকে বেশি সম্মানি সৃষ্টি করিনি। আকাশরাজী ও জমিনসমূহ সৃষ্টির অনেক (চৌদ্দ হাজার, মতান্তরে ২০ লাখ বৎসর পৃথিবীর হিসাব মত পাঁচশত ১১ কোটি বছর) আগে ঐ নাম আমার নামের সাথে আরশে লিখে রেখেছি। (আস-সুন্নাহ, ইবনে আসেম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০৫; জওয়ামেউল আহাদিস, হযরত আহমদ রেজা খান বেরলবী)

'মাতয়ালে আল মসরাত ফী শারহে দালায়েলুল খায়রাত' কিতাবে আছে, আল্লাহ্ বলেন, হে মুসা (আ.) সমস্ত (মোরসাল) নবীগণ রাসূলগণের মধ্যে যে কেউ 'আহমদ' এর আনুগত্য ও সত্যতার অস্বীকারকারী তাঁদের ভাল কাজও মরদূদী। তারা হেকমত হতে বঞ্চিত এবং হেদায়তের আলোতে অ-প্রবেশযোগ্য। তাদের নবুয়তের দপ্তর হতে নাম কাটা পড়বে।' মাওলানা রুমি (রহ.) 'মসনবী'তে বলেন, 'এই জগতে আহমদের দ্বিতীয় জন্ম, তাঁর নুরী জগতে শত শত কিয়ামত নিহিত। 'আহমদ' নাম মোবারকে সমস্ত নবীদের নাম নিহিত,

যেমন (১০০) একশত' আমাদের সামনে এসেছে যার মধ্যে (৯৯) নিরানব্বই নিহিত। বাদশাহ্দের নাম মুদ্রা হতে মুছে দেয়া হয় আহমদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত অঙ্কিত থাকবে।' তিনি আরো বলেন–

বুদ্ দরা ইঞ্জিল নামে মুস্তফা + আঁ সারে পয়গাম্বররা বাহরে সাফা।
বুদ্ যেকরো হিলইয়াহা ও শাকলে ঊ+বুদ্ যেকরো গায্ বো সওমো আকলে ঊ।
তায়েফা নাসরানিয়াঁ বাহরে সওয়াব+চুঁ রসীদান্দে বদাঁ নামো খেতাব।
বুসা দাদান্দে বদাঁ ন্দমে শরিফ+রো নেহাদান্দে দদাঁ ওয়াসফে লতিফ।
আয়মান আয্ শররে আমীরাঁ ও ওযীর+দরা পালাহে নামে আহমদ মুস্তাজীর।
নসলে ঈশাঁ নীম হাম বিসইয়ারা শোদ+নামে আহমদ নাসের আমদ ইয়ার শোদ।
ওয়াঁগরহু দীগর আই নাছ রানিয়া+নামে আহমদ দাশ্তান্দে মোস্তাহ্ঁ শোদ।
মোস্তাহ্ঁও খার গাশতান্দ আযফেতান+আয ওযীরে শোমে রায়ে শোম ফান।
মোস্তাহ্ঁও খার গাশতান্দা শরিক+গাশতা মাহরূম আর্থ খোদো শর্তে তরীক।
হাম মুখাব্বাত দ্বীনে শাঁ ও হুকমে শাঁ+আয পায়ে তূমার হায়ে কায কয়াঁ।
নামে আহমদ চুঁ চুনীঁ ইয়ারী কুনাদ+তাকে নূরাশ চুঁ মদদগারী কুনাদ।
নামে আহমদ চুঁ হেসারে শোদ হাসীন+তা চে বাদাশ যাতে আঁ রুহুল আমীন।

অর্থ: ইঞ্জিল কিতাবে রয়েছে ঐ নামে মুস্তফা (দ.), যিনি সমস্ত পয়গম্বরগণের প্রধান এবং নির্মলতার সাগর। ঐ কিতাবে তাঁর অবয়ব, আকৃতি ও দৈহিক গঠন লিখিত ছিল। তাঁর জিহাদ, রোজা, খাওয়া-দাওয়া সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। নাসারাদের একটি দলের অভ্যাস ছিল কিতাবটি তেলাওয়াত করার সময় যখন ঐ নাম ও পদবীর স্থানে পৌঁছাত, তখন ঐ নাম মোবারকের উপর চুম্বন করত। তাঁর প্রশংসার উপর মুখমণ্ডল রাখত। তারা 'আহমদ' নামের আশ্রয় গ্রহণ করে দুষ্ট বাদশা, মন্ত্রীদের দুষ্টামি হতে নিরাপদে ছিল। অন্যদের থেকে তাদের বংশাবলীও বৃদ্ধি পেয়েছে। 'আহমদ' নাম তাদের সহায় এবং সাহায্যকারী সাথী ছিল। নাসারাদের আরেক দল ছিল 'আহমদ' নামের অবমাননাকারী। তারা দুষ্ট বাদশা, মন্ত্রীদের ফেতনার পাল্লায় পড়ে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হলো। এই অপদস্থতা এবং লাঞ্ছিতের কারণে নিজেদের অস্তিত্ব হারাল। ধর্ম হতেও বঞ্চিত হল। ঐ পুস্তককেও বক্র বর্ণনার কারণে তাদের ধর্ম, আইন-কানুন বিনষ্ট হয়ে গেল। 'আহমদ' নাম মোবারক এরূপ সহায়ক হলে, তাঁর নূর মোবারক কিরূপ সাহায্যকারী হতে পারে। 'আহমদ' নাম মোবারক সুদৃঢ় দূর্গ হলে তার জাত রুহুল আমীনের কি বর্ণনা হতে পারে? (মসনবী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫০)

ইমাম সিরাজ উদ্দীন বালকিনি (রহ.) উল্লেখ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা তার হাবীবকে বলেছেন, আমি আপনাকে সাতটি এহসান করেছি প্রথমটি হচ্ছে, আসমানে এবং জমিনে এমন কোনো জিনিস সৃষ্টি করি নাই যা আপনার থেকে বেশি সম্মানি হবে।

'তাজয়ীল' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হক জাল্লে আলা আপন হাবীবকে বলেছেন, হে মুহাম্মদ (দ.)! আপনি আমার নূরের নূর, আমার রহস্যের রহস্য, আমার মারিফতের (পরিচিতির) খাজিনা। আমি আপন আরশ হতে জমিনের শেষ স্তর পর্যন্ত আপনার উপর উৎসর্গ করেছি। আমার সৃষ্টি আমার সন্তুষ্টি চায়, আর আমি আপনার সন্তুষ্টি চাই। এটাই হলো 'আহমদ মোজতবা'র (দ.) শান। (জওয়ামেউল আহাদিস, হযরত আহমদ রেজা খান বেরলবী, ৪ খন্ড, পৃ:২৯-৪০)
জওহরে হাকিকি (হাকিকতের প্রকাশ)

হুজুর পাক (দ.) 'জাওয়ামিউল কালামের ইলাহি' (ইলাহির সমস্ত সিফাতের সমাবেশ স্থল) (সহিহ্ বুখারী, হাদিস-৩০৭৫) অর্থাৎ জওহরে হাকিকি। জওহরের দুইটি নাম আহমদ এবং মুহাম্মদ।

ইমাম কুসতলানি, ইমাম ইবনে তুগরুগ এর বরাত দিয়ে 'মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া' কিতাবে রেওয়ায়েত করেন, আদম (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে আরজি করলেন, মাবুদ আপনি আমার কুনিয়ত বা উপনাম আবু মুহাম্মদ কেন রাখলেন? আল্লাহ্‌র হুকুম হল, হে আদম! উপরের দিকে মাথা উঠাও। তিনি মাথা উঠালেন, দেখলেন, আরশ আজিমের সব জায়গায় নূর চমকাচ্ছে। তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ্ এই নূর কী? আল্লাহ্ বললেন, ইহা একজন নবীর নূর। তোমার সন্তানগণ থেকে। তাঁর নাম আসমানে 'আহমদ', জমীনে 'মুহাম্মদ'। যদি তিনি না হতেন তবে আমি না তোমাকে সৃষ্টি করতাম না আসমান-জমিন সৃষ্টি করতাম। (জামিউল আহাদিস, হযরত আহমদ রেজা খান বেরলবী, ৪ খন্ড, পৃ.২৪; মুসতাদরাক আল হাকিম, ২য় খন্ড, পৃ.৬১৫)।

জওহরে হাকিকির দুইটি দিক, যথা– (১) জাত ও (২) সিফাত।
'জাত' এর প্রশংসার দুইটি ধরণ বা অবস্থা। যথা– (ইল্‌ম) জ্ঞান এবং (খুভি) শক্তি। সুতরাং আল্লাহ্‌র হাবীব (দ.) হলেন জ্ঞানী (আলীম) (প্রমাণ: সূরা আল ইমরান : ৬৪, সূরা তাওবা : ১২৮) এবং হুকুমদাতা (হাকীম) (যেমন: সূরা নিসা : ৬৫, সূরা নূর : ৫১)। শক্তির (খুভি) তিনটি অবস্থা– (১) নাসুতী (দৃশ্য জগত), (২) মালাকুতী (ফেরেশ্‌তা জগত), (৩) জাবরূতী (প্রভাব বিস্তারকারী জগত)।

এই খুভি বা শক্তি হেকমতের জ্ঞান নিয়ে প্রকাশ্য বিন্দুতে পরিণত হয় অর্থাৎ প্রকাশ্য রূপধারণ করে। অতঃপর এই শক্তিময় বিন্দু বা প্রকাশ্য রূপ ছুল্লাছ বা বড়-মধ্যম-ছোট তিন ভাগে রূপান্তর হয়– তথা (১) আহাদিয়ত, (২) ওয়াহেদিয়ত, (৩) আইনুল আয়ান।
এই খুভি বা শক্তি দুই প্রকারের (১) তাফসিলি (২) তাখইলি।
প্রত্যেকটির আবার দুটি দিক হয়, একটি সীফলী-নিম্ন/নিচের দিকে, অপরটি উলুব্বী-উপরের দিকে। (আল ইনসানুল কামিল; ফুতুহাতে মক্কীয়া; এস্তেলেহাতে সুফিয়াহ্)

আলমে উলুব্বী– ঊর্ধ্বজগতের দিককে 'আহমদ' নামে এবং আলমে ছীফলী/ নিম্ন জগতের দিককে– 'মুহাম্মদ' নামে নামকরণ করেন। 'ফিস্‌সামায়ে আহমদ ওয়া ফীল আরদি মোহাম্মদ'

(জামিউল আহাদিস, হযরত আহমদ রেজা খান বেরলবী, ৪ খন্ড, পৃ.২৪)। তিনি জাহের ও বাতেনের খোদায়ী বিকাশ ধারাসমূহের সঙ্গমস্থল অর্থাৎ ‘মসিয়তে ইজদানি’র কেন্দ্রবিন্দু, পবিত্র কুরআনের ভাষায় (সূরা ফুরকান : ৫৩) দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল (ইনসানুল কামিল, পৃ. ১৪-২০)।

অদৃশ্য-দৃশ্য জগৎ তথা গুপ্ত-ব্যক্ত তথা অদৃশ্য প্রকৃতির দৃশ্য আকৃতি তথা ‘আদম বা’ছুরতে মুহাম্মদী’ বা ‘খালাকাল্লাহু আদম আলা সূরাতীহি’ বা ‘খালাকাল্লাহু আদামা আলা সূরাতীর রহমান’ (সহিহ্ বোখারি ও সহিহ্ মুসলিম)। যথা গাছ ও বিচিতে যথাক্রমে ব্যক্ত দৃশ্যমান অবস্থাতে অদৃশ্য প্রকৃতির দৃশ্যরূপ বটে (বেলায়তে মোত্লাকা, ৯ম অধ্যায়)। যেহেতু নিরাকারের কোন সূরাত থাকতে পারে না। তাই মহান স্রষ্টা তাঁর প্রশংসাকে (হামদ)কেই রূপদান করেছেন। একারণেই আল্লাহ্ পাক সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই তাঁর হাবীব হুজুর (দ.) এর প্রশংসাকারী, তাই তিনি ‘আহমদ’ নামে ভূষিত।

সংস্কারসমূহ

পৃথিবীতে অনেক মহামানব তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী, মতবাদ ও আদর্শের কারণে মানব জাতির নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু গুণাবলী ও মতবাদ তাঁদের নিজস্ব চিন্তা থেকে উদ্ভব হয়ে থাকে। ফলে তাঁদের গুণাবলী মানব সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে না। এমনকি কালক্রমে মানুষের মনোজগৎ থেকে এগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। প্রান্তরে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)কে আল্লাহ্ পাক এরূপ অনুপম চরিত্র মাধুর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে মহানবী (দ.)-এর যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কোন মানুষ তাঁর অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করতে সম হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন: “নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ।” [সূরা আহযাব : ২১] অপর আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন: “এবং নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।” (সূরা কালাম : ৪)

আল্লামা শেখ সাদী (রহ.) লিখেছেন:
বালাগাল উলা বি কামালিহি + কাশাফাদ্ দুজা বি জামালিহি।
হাসুনাত জামীউ খিসালিহি + সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি।
অর্থ: আরোহন করেছেন তিনি পূর্ণতার সর্বশীর্ষে, তাঁর সৌন্দর্যে সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হয়েছে। অপূর্ব চরিত্র তাঁর অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত, সালাম তাঁকে, সালাম তাঁর পরিবারবর্গকে।

হযরত মুহাম্মদ (দ.)’এর আদর্শে রয়েছে জীবনের নিরাপত্তা। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটি শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। জীবনের নিরাপত্তা তথা স্বাভাবিক জীবন ও মৃত্যুর গ্যারান্টি মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম তথা রাসূল (দ.) এর আদর্শ মানুষকে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই ইসলাম

হত্যাকাণ্ডকে হারাম ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে।" [সূরা মায়িদা : ৩২] এভাবে ইসলাম দিয়েছে সম্পদ, মান-মর্যাদা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বসবাস, খাবার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ইনসাফ বা ন্যায়বিচারসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক নিরাপত্তা। এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (দ.) আরবের তথা মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন আনেন, তার তুলনা সত্যিই বিরল। পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

বার্ণার্ড শ' বলেন, "যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একনায়কের শাসনাধীনে আনা হতো তবে একমাত্র মুহাম্মদই (সঃ) সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।" একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, রাসূলুল্লাহ্ই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন।

ধর্মীয় সংস্কার (Religion Reforms)ঃ ভন ক্রেমার বলেন, "নিকৃষ্ট ভক্তিযোগ্য বস্তুপূজা হতে কঠিন এবং অনমনীয় একেশ্বরবাদ – এটাই ছিল ইসলামের ধর্মীয় সংস্কার।" ("From gross fetishism to severe and unbending monotheism - such was the religious reform effected by Islam.") পৌত্তলিকতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, বস্তুপূজা, প্রভৃতি যখন আরবের ধর্মীয় জীবনকে কলুষিত করছিল, হযরত মুহাম্মদ (দ.) তখন তৌহিদের বাণী প্রচার করেন। কলেমা তওহীদে একেশ্বরবাদের অমোঘ বাণী ঘোষিত হয়েছেঃ "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই; মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ।" একেশ্বরবাদের মূলমন্ত্রে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) সমগ্র ইসলাম জগতকে একটি ভ্রাতৃসংঘে আবদ্ধ করেন। হিট্টি বলেন, মুহাম্মদ (দ.) এমন একটি ধর্মগ্রন্থ প্রদান করেন যা আজও বিশ্বের এক-অষ্টমাংশ অধিবাসীদের নিকট সমস্ত বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত।" ইসলামের বিজয়কে ধর্ম অর্থাৎ তৌহিদের বিজয় বলে মনে করা হয়।

সামাজিক সংস্কারঃ সমাজ সংস্কারক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (দ.) যে অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক বিবর্তন আনয়ন করেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তিনি মুসলমানদের একটি জাতিতে আবদ্ধ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম রক্ত অথবা কৌলিন্যের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতি গঠন করেন। জুয়া খেলা, মদ্যপান, অহেতুক রক্তপাত, কুসীদ গ্রহণ, ব্যভিচার, প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনিই জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁর ভাষায়, "সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী।" তিনি দাসত্ব প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। ক্রীতদাস জায়েদকে সেনাপতিত্ব দান করেন। হাবসী ক্রীতদাস হযরত বেলাল ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হন। আনাস, সালমান ফারসী ও সুহায়েব রুমী এবং অপরাপর ক্রীতদাসগণ সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন।

হযরতের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি। প্রাক-ইসলামী যুগে নারী পণ্যদ্রব্যের মত অবহেলিত ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ কুরআনের বাণী প্রচার করে বলেন, "পুরুষের নারীর উপর যতটা অধিকার আছে, নারীরও পুরুষের ওপর ঠিক ততটা অধিকার রয়েছে।" বিবাহ, বিধবা বিবাহ, তালাক, স্ত্রীলোকের মৃত পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রভৃতি বিধান দ্বারা হযরত সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন। মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তিনি বলেন, "মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশ্ত।" মন্টোগোমারী ওয়াট বলেন, "মুহাম্মদ (সঃ) একজন সমাজ সংস্কারক; বস্তুত তিনি নৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত করেন। তিনি একটি নূতন সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং একটি পারিবারিক সংগঠন নির্মাণ করেন যা পূর্বের সকল সংগঠন অপেক্ষা উন্নত ধরনের ছিল। বর্তমান মানবসমাজের এক-ষষ্ঠাংশের জন্য ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেন।"

রাজস্ব ব্যবস্থা: রাসূল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু ও জনকল্যাণকর রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের রাজস্বের উৎস ছিল 'যাকাত', 'জিজিয়া', 'খুমস্', অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ, 'উশূর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে 'যাকাত' অন্যতম এবং নামায আদায় ও যাকাত দানের কথা এক সঙ্গে কুরআনে উল্লেখ আছে। 'যাকাত'-এর উৎপত্তি হয়েছে 'যাকা' শব্দ হতে এবং 'যাকা' অর্থ বৃদ্ধি অথবা বিশুদ্ধকরণ। বিত্তশালী ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত যে পরিমাণ অর্থ স্বেচ্ছায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের প্রদান করা হয় তাকেই 'যাকাত' বলে। প্রতিটি বিত্তশালী মুসলমানের জন্য এই যাকাত বাধ্যতামূলক। এই যাকাত সম্পদের উপর বৎসরে শতকরা আড়াই ভাগ দান করা হয়। তাবুক অভিযানের পর অমুসলমান খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায় তাদের জান-মালের নিরাপত্তা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে অব্যাহতি পাবার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রকে 'জিজিয়া' কর প্রদান করতো। উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্রকে প্রদান করবার যে ব্যবস্থা ছিল তা 'উশূর' নামে পরিচিত ছিল। এ ছাড়া যুদ্ধ-শেষে শত্রুদের যে সমস্ত ধন-সম্পদ মুসলমানদের দখলে আসত তার এক পঞ্চমাংশ (খূমস্) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হত। এছাড়া ভূমি-রাজস্ব অথবা খারাজও প্রচলিত ছিল।

রাজনৈতিক সংস্কার: হযরত মুহাম্মদ (দ.) একটি বিবদমান আরব জাতিকে সুসংঘবদ্ধ মুসলিম জাতি অথবা উম্মতে পরিণত করেন। মদিনা সনদ গোত্র-প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে একটি নুতন জাতির প্রতিষ্ঠা করে। স্বৈরাচারী শাসন অথবা শেখতন্ত্রের পরিবর্তে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি লাভ করে। হিট্টি যথার্থই বলেন, "মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বৃহত্তম ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।" তিনি আরও বলেন, আরব জাতির একমাত্র বন্ধন গোত্র-প্রীতি; এটা একটি মাত্র আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং ঈমান (বিশ্বাস) এর স্থান অধিকার করে।

প্রশাসনিক সংস্কার: মদীনা ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রাসূল কারিম (দ.) সর্বপ্রথম ইসলামী প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করেন। ঐশীতন্ত্রের (Theocracy) এবং গণতন্ত্রের সমন্বয়ে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে থাকে। মুসলিম বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক রাসূলুল্লাহ্ রাষ্ট্রপতি হিসাবে যে ভূমিকা পালন করেন তা পরবর্তী কালের জন্য উদাহরণস্বরূপ। কুরআনের নির্দেশ, স্বীয়-বিচারবুদ্ধি এবং ধার্মিক ও শিক্ষিত মুসলিম সমাজের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ মদিনায় স্থাপন করে সেখানে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কার্য সমাধা করতেন। এই মসজিদটি ছিল তাঁর বিদ্যালয়, প্রার্থনাগার, সরকারি দপ্তর, সভাগৃহ ও বৈদেশিক দূত ও গোত্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে মিলনের স্থান।

শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়; যেমন– খাইবার, মক্কা, তায়েফ, তায়ামা, সানা, ইয়েমেন, হায়দ্রামাউত, ওমান ও বাহরাইন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা অথবা 'ওয়ালী' শুধুমাত্র ইমামই ছিলেন না, প্রধান সেনাপতি, বিচারক এবং প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করতেন। শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণের ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দুরীভূত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের রাজস্ব প্রধানত পাঁচটি উৎস হতে গ্রহণ করা হত; যথা যাকাত ও সাদকাহ্, খারাজ, জিজিয়া; গনিমাহ্ অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির এক-পঞ্চমাংশ অথবা খুমস্, আল্-ফে অর্থাৎ সরকারি খাস জমি।

মুসলিম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একমাত্র ওহুদের যুদ্ধ ব্যতীত তিনি সমস্ত যুদ্ধেই জয়লাভ করেন এবং এটা তাঁর সামরিক দক্ষতা, কুশলতা এবং তেজস্বীতার পরিচায়ক। নিয়মিত সেনাবাহিনী না থাকলেও প্রয়োজনে বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করা সম্ভবপর ছিল। এই কারণে তাবুক অভিযানে ৩০০০০ সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

নবী করীমের (দ.) আমলে শিক্ষাদীক্ষার চর্চা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়; কারণ তিনি স্বয়ং এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই সময়ে মসজিদ মক্তব স্থাপন করে নিররতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। কুরআন পাঠ, শরীয়ত শিক্ষা, লিখন পাঠ ও ব্যাকরণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। হযরত বলেন, "প্রয়োজন হলে পদব্রজে চীন গমন করে বিদ্যা অর্জন কর।" তিনি আরো বলেন, "শহীদের রক্ত অপো জ্ঞানী ব্যক্তিদের কালি অধিকতর পবিত্র।"

অর্থনৈতিক সংস্কার: প্রাক ইসলামী যুগে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (দ.) একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের মানসে অসামাজিক কার্যকলাপ; যেমন কুসীদ ব্যবসা বন্ধ করে দেন, এর পরিবর্তে তিনি যাকাত ফিত্‌রা, সাদ্‌কার প্রবর্তন করেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেন। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সম্পদ যাতে জনসাধারণ উপভোগ করতে পারে তারই বন্দোবস্ত করেন। বাইতুল মাল হতে গরীব-দুঃখীকে অর্থ সাহায্য দান করা হত।

জাতিগঠক:

ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে এডওয়ার্ড গীবন বলেন, "ইহা এমন একটি স্মরণীয় বিপ্লব যাহা পৃথিবীর সমস্ত জাতিসমূহের উপর একটি নূতন এবং চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।" (It was one of the most memorable revolution which have impressed a new and laughing character on the nations of the globe.) ইসলামের মহান ভ্রাতৃসংঘ এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া হযরত মুহাম্মদ (দ.) অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন তাহা তাঁহারই দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মদীনা চার্টারে রাষ্ট্রনায়ক এবং সংগঠক হিসেবে তাহার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার ছাপ রহিয়াছে। বিবদমান আরবজাতিকে তিনি সুসংঘবদ্ধ করিয়া শুধু একটি নূতন জাতিতেই পরিণত করেন নাই, বরং ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কৌলিন্যের পরিবর্তে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসে একটি সমাজ গঠন করেন। গোত্র-প্রীতির স্থলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল তাঁহার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিট্টি সত্যই বলেন, "আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।"

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক খোদা বক্স বলেন, "রাসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য ছিল গোত্র প্রথার বিলুপ্তি এবং ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা।" উদার এবং সহনশীলতার পরিচায়ক, মদীনা চার্টারে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ নীতিতে তিনি শুধু একটি সুসংঘবদ্ধ জাতিই গঠন করেন নাই, বরং এমন একটি সর্বপ্রথম অলিখিত সংবিধান তৈরি করেন যাহা পরবর্তীকালের সংবিধানগুলির অগ্রদূত ছিল। গীবনের মতে, "মহানবী ধর্মনেতা, রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন। উপরন্তু খোদার উপর প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতীত মানবজাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থাকিয়া যাইতো।"

মহানবীর ছিলেন বিশ্বশান্তির পথিকৃৎ। সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা ও শান্তির বাণী তাহার জীবনের কার্যাবলীকে সার্থক করিয়াছে। তিনিই একমাত্র মহানবী যিনি তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার কার্যের সফলতা অবলোকন করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি কে "ফাতহুম মুবিন" অর্থাৎ "মহাবিজয়" বলা হইয়াছে। এই চুক্তিটি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করে। ইহার ফলে রাসূল ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন রাজদরবারে দূত প্রেরণ করিয়া ইসলামের প্রতি বিধর্মীদের আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। এইভাবে "মদিনার ধর্মভিত্তিক সমাজ হইতে উত্তরকালে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে। মরণশীল জীবনের অতি স্বল্প পরিসরে হযরত মুহাম্মদ (দ.) বিশৃঙ্খল ও প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়া এমন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি ও সুশৃংখল রাষ্ট্র গঠন করেন যাহা ইতিপূর্বে শুধুমাত্র ভৌগলিক সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল।"

বিখ্যাত পন্ডিত কার্লাইল বলেন, "আরব জাতির জন্য ইহা (ইসলামের আবির্ভাব) অন্ধকারে আলোর সমতুল্য এবং ইহার আলোকে আরব দেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল।" মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে, কারণ তিনি "রহমাতুল্লিল আলামিন" অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

জন্য রহমত বা আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁহার প্রতিটি কথা ও কার্যকলাপ ভবিষ্যৎ মুসলিম জীবনের পাথেয়। এই কারণে আমির আলী বলেন, "একটি মহান কার্য চমৎকার এবং বিশ্বস্ততার সহিত সুসম্পন্ন করিবার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইতেছে তাঁহার (পুত-পবিত্র) জীবন।" আন্তঃগোত্রীয় বিবাহ, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র সম্পর্কিত নানাবিধ আইন-কানুন প্রবর্তন দ্বারা তিনি মুসলিম সমাজ তথা ভবিষ্যৎ মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে যথার্থই বলা হইয়াছে, "বিশ্বের সমস্ত ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (দ.) সর্বাপেক্ষা কৃতী (বা সার্থক) ছিলেন।"

'মুজতাবা' এর শব্দগত ব্যাখ্যা

মুজতবা শব্দটি 'ইজবাতা' শব্দ হতে এসেছে, যার অর্থ হলো– বাছাই করা, চয়ন করা নির্বাচিত, মনোনীত করা, পছন্দ করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– 'তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন' (সূরা নাহল : ১২১)।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন– "তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস অবিশ্বাসী / কী পাওয়া যায় দেখ না বারেক হযরতে মোর ভালবাসি/ এই দুনিয়ার দিবা-রাতি/ ঈস হবে তোর নিত্য সাথী/ তুই যা চাস তাই পাবি হেথায়/ আহমদ চান যদি হেসে।"

শেষ করি তাঁর বিখ্যাত 'নাম মুহাম্মদ বোল্' গানের দুই চরণ দিয়ে–

"নাম মুহাম্মদ বোল্ রে মন, নাম আহমদ বোল্
যে নাম নিয়ে চাঁদ-সিতারা আসমানে খায় দোল"

দরূদ পাঠের ফযিলতের রহস্য

কুরআন দিয়ে নামায ফরয হওয়ার দলিল হয় 'ওয়াকিমুস সালাত', রোযা ফরজের দলিল হয় 'কুতিবা আলাইকুমস সিয়াম', হজ্জের দলিল হয় 'ওয়াতিম্মুল হজ্জ', যাকাতের দলিল হয় 'ওয়াআতুয্ যাকাত' যা ফরয হিসেবে মান্য করা হয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যে প্রকার কুরআনের নস/দলিল দিয়ে ফরয সাব্যস্ত হয় একইভাবে প্রিয় নবীর (দ.) উপর দরুদ শরিফ পড়া ও কুরআনের নস/দলিল দিয়েই ফরয সাবাস্ত্য যেমন– 'আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর উপর দরুদ-সালাম পড়ার মতই যথাযথ পড়' (সূরা আহযাব : ৫৬)। যেহেতু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মূল ও একমাত্র সেতুবন্ধন হলেন রাসূল (দ.) এবং আল্লাহ্ নিজেই তাঁর প্রশংসাকারী (দরুদ পাঠকারী), সেহেতু যথাযথ দরুদ-সালামও তাঁরই জন্য।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (দ.) বলেছেন, 'আমার উপর যে একবার দরূদ পড়ে আল্লাহু তাঁর উপর দশ বার দরূদ পড়ে।' আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রাসূল (দ.) বলেছেন, 'যে আমার উপর একবার দরূদ শরিফ পড়বে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার দরূদ শরিফ পড়বেন, দশটি গুণাহ্ ক্ষমা করবেন।' (সহিহ্ মুসলিম)

লেখক: গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন

ইবনে আবদুশ শাকুর

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব সারকারে দো-আলম নূরে মুজাস্‌সাম (দ.) এর মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন, '(হে রাসূল!) আমি আপনাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি'[১]। এই আয়াত আমাদের সামনে এটাই স্পষ্ট করে যে, 'রাব্বুল আলামীন' আল্লাহ্‌তায়ালা হলেন সকল সৃষ্টির রব আর 'রহমাতুল্লিল আলামীন' রাসূল (দ.) হলেন সকল সৃষ্টির জন্য রহমত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) 'রহমাতুল্লিল আলামীন' এর একটি ব্যাখ্যা করেছেন, (নবী করিম (দ.) হলেন সৃষ্টির জন্য) 'নি'য়ামত ও অনুগ্রহ' স্বরূপ[২]। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, '(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র 'অনুগ্রহ' ও তাঁরই 'রহমত' প্রাপ্তিতে তোমাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তোমাদের পুঞ্জীভূত ধনসম্পত্তির চেয়ে এ অনেক শ্রেয়'[৩]। পূর্বের আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে। আর এই আয়াতে 'রহমত' প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশের কথা বলা হচ্ছে, সুতরাং যে দিন নূর নবী (দ.) দুনিয়াতে আগমন করেন সেদিনে আনন্দ-উৎসব করা পবিত্র কুরআনেরই নির্দেশনা। এই দিনকে 'ঈদ' বলা হয়, কারণ পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'মরিয়ম তনয় ঈসা বললেন, হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! আকাশ থেকে আমাদের জন্য পাত্রভরা খাবার প্রেরণ করুন। এ হবে আমাদের জন্য, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য 'ঈদ' তথা আনন্দ-উৎসব এবং আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত সত্যের নিদর্শন'[৪]। সুতরাং মহান আল্লাহ্ হতে 'রহমত' প্রাপ্তির দিনটি বান্দার জন্য ঈদ হয়। আর এই দিনে আনন্দ করা নবীদের (আ.) সুন্নাহ্।

এছাড়াও আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে নবী করিম (দ.) এর জন্মভূমির শপথ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমি শপথ করছি এই নগরীর। আর আপনি এই নগরীর অধিবাসী। শপথ জনক ও জাতকের'[৫]। এখানে নগরী বলতে পবিত্র মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। আর তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে রাসূলে করিম (দ.) এই শহরে আগমন করেছেন। আর তৃতীয় আয়াতে 'ওয়ালিদ' বা জনক দ্বারা হযরত আদম ও হযরত ইব্রাহীম (আ.) অথবা প্রত্যেক পিতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এক বর্ণনায়, 'মা ওয়ালাদ' দ্বারা মহানবী (দ.) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে (সূত্রঃ তাফসিরে মাযহারী)।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ অন্যান্য নবীগণের 'বিলাদত' বা জন্মদিবসের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন– হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.) এর জন্মদিবসের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, 'আর তাঁর প্রতি শান্তি– যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যেদিন ইন্তিকাল করেছেন, আবার যে দিন তাঁকে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে'[৬]। হযরত ঈসা (আ.)

এর জন্মদিবসকে সম্মানের সাথে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'এবং শান্তি আমার প্রতি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার ইন্তিকাল হবে আর যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো'[৭]। সুতরাং নবী-রাসূলগণের জন্মদিবস স্মরণ করার নির্দেশনা পবিত্র কুরআন হতেই আমরা পাই।

হাদিস শরিফে এসেছে, 'নবী করিম (দ.) নবুয়াত প্রকাশের পর নিজের আকিকা করেন'[৮]। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) 'হাসানুল মাক্‌দেস ফি আমালিল মাওলেদ' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'এটা ছিল তাঁর পয়দায়েশ এবং তাঁকে (দ.) সমস্ত জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরণের জন্য এবং উম্মতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ব্যাপারটা এমন যে, যেমন হুজুর (দ.) নিজে নিজের উপর দরুদ প্রেরণ করলেন। অতএব আমাদের জন্য মুস্তাহাব যে, শোকরিয়া জ্ঞাপন স্বরূপ হুজুর (দ.) এর মিলাদে মুসলমানদের সার্বজনীন সমাবেশ করা, খানাপিনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজনের মাধ্যমে আনন্দ-উৎসব প্রকাশ করা[৯]। অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-কে সোমবার রোজা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন, ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিন আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছিল'[১০]। এ থেকে তিনটি বিষয় বুঝা যায়– এক. স্মৃতিচারণ করা, দুই. এজন্য তারিখ নির্ধারণ করা এবং তিন. রাসূল (দ.) এর জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নেক আমল করা। এছাড়াও হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (দ.) সাহাবিদের সমাবেশে নিজের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন[১১]। অর্থাৎ সমাবেশ করে মিলাদ মাহফিল করাও সুন্নাহ। অন্য হাদিসে এসেছে, একদা হযরত আবুদ্দারদা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সঙ্গে হযরত আবু আমির আনসারীর গৃহে গমন করে দেখলেন আবু আমির তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সমবেত করে রাসূল (দ.) এর মিলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত তালীম দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, এই দিনটি অর্থাৎ হযরত আবু আমির রাসূল (দ.) এর জন্মের দিনটি নিয়ে আনন্দ উল্লাস করছিলেন। এতদশ্রবণে রাসূল (দ.) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, হে আবু আমির! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার জন্য রহমতের দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং তোমার জন্য সমস্ত ফেরেশ্‌তা ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। যারা তোমার ন্যায় এ ধরনের কাজ করবে তারা মুক্তি লাভ করবে'[১২]। আর রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর মিলাদে আনন্দিত হওয়ার পুরস্কার সম্পর্কে সহিহ্ বুখারীর হাদিসে এসেছে, 'আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার পরিবারের একজন অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রা.) স্বপ্নে তাকে খারাপ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আবু লাহাব! তুমি কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছ? তদুত্তরে সে বলল, তোমাদের হতে পৃথক হওয়ার পর আমি ভীষণ আজাবের মধ্যে গ্রেফতার আছি। তবে প্রত্যেক সোমবার আমার শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি চুষে কিছু পানি পাই, এতে আমার আজাব অনেকটা কম অনুভূত হয়। কেননা যখন হযরত মুহাম্মদ (দ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন সুওয়াইবা নাম্নী আমার এক ক্রীতদাসী আমাকে সংবাদ জানায়। সে সংবাদ পেয়ে আমি খুশি হয়ে তাকে এ আঙ্গুলি দুটি দ্বারা ইশারা করে আজাদ করে দিয়েছিলাম। এই জন্যই আল্লাহ্ ঐদিন আমাকে শাস্তি কম দেন'[১৩]। সুতরাং রাসূল (দ.) এর জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা এবং এই উপলক্ষে

বিভিন্ন নেক আমল করা, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা ও স্মৃতিচারণ করা, এর জন্য খানাপিনা আয়োজন করা একান্ত জরুরী এবং অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী (রহ.) 'ওরফুত তা'রিফ বিল মাওলেদ আশ শরিফ' গ্রন্থে বলেন, 'আবু লাহাবের মত কট্টর কাফির, যার সম্পর্কে কুরআন মজিদে অভিশাপ নাজিল হয়েছে, এরপরও হুজুর (দ.)-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশ করায় সোমবার রাত্রে তার শাস্তি লাঘব করে দেয়া হয়। তাহলে যারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদিতায় বিশ্বাসী, নবীর উম্মত, যারা তাঁর মিলাদে আনন্দ ও উৎসব প্রকাশ করে এবং সাধ্যমত তাঁর মুহাব্বতে দান-খয়রাত করে, তাদের কী সৌভাগ্য হবে? আমার জীবনের কসম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিফল দান করবেন এবং তাঁর ফজল ও করমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, 'ইমাম শামসুদ্দীন আস সাখাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, মাহফিলে মিলাদুন্নবী (দ.) এর প্রচলন কুরুনে সালাসা (সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ এর যুগ) এর পর শুরু হয়েছিল। যথাসম্ভব খালেস নিয়তের উপর ভিত্তি করে এর সূচনা করা হয়েছিল। এরপর থেকে সারা বিশ্বে এবং বড় বড় শহরে হুজুর (দ.) এর পবিত্র বেলাদতের মাসে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন হয়ে আসছে এবং এর মর্যাদা ও শান, উন্নত যিয়াফত ও বর্ণাঢ্য খানাপিনার আয়োজনের মাধ্যমে আজও অটল রাখা হয়েছে। এখনো মিলাদুন্নবীর মাসে নানারকম দান-খয়রাত, আনন্দ-উৎসব করা হয় এবং অধিক হারে নেক কাজ করা হয়। বরং মিলাদুন্নবী (দ.) এর মাস ঘনিয়ে আসলেই, বিশেষ আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ফলে এ পবিত্র মাসের বরকতে আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক বড় বড় করুণা ওদের প্রতি প্রকাশ পায়। এটা পরীক্ষিত আমল। যেমন ইমাম শামসুদ্দীন আয যাযারী আল মাকরী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, মিলাদুন্নবী (দ.) উদযাপনের ফলে সারা বছর নিরাপদ, শান্ত থাকে এবং মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ সহসা পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) 'ইকতিদা-এ সিরাতুল মুস্তাকিম লি মুখালেফাতে আসহাবুল জাহিম'-গ্রন্থে বলেন, 'ঐ দিনটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা, সেই দিনের তাজীম করা, নেক নিয়ত করা এবং হুজুর (দ.) এর মুহাব্বতের কারণে মহান প্রতিদানের সহায়ক হতে পারে।[১৪]

নানা ধরনের মতবাদ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন ঘিরে মানব সমাজ আজ বহুধা বিভক্ত। এ সকল মতাদর্শগুলোর মধ্যে অনেক মতবাদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণকারী এবং কোন কোনটি নৈরাশ্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী এবং অনৈতিকতাবাদী। এদের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডাও বহুমুখি ও বহুমাত্রিক। এ ধরনের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও দর্শনকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরাভূত করার এবং নূর নবীর (দ.) সর্বজনিনতা ও বিশ্বশান্তির মতাদর্শকে প্রচারের লক্ষ্যে তাঁর পবিত্র জন্মদিবসে প্রকাশ্যে বিশাল গণ-জামায়েত এবং শোভাযাত্রা প্রদর্শনের আয়োজন করা সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্রঃ

১. আল কুরআন, সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭।

২. তাফসিরে ইবনে আব্বাস, ই.ফা., ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৭।

৩. আল কুরআন, সূরা ইউনুসঃ ৫৮।

৪. আল কুরআন, সূরা মায়েদাঃ ১১৪।

৫. আল কুরআন, সূরা বালাদ. ১,২,৩।

৬. আল কুরআন, সূরা মরিয়মঃ ১৫।

৭. আল কুরআন, সূরা মরিয়মঃ ৩৩।

৮. মিলাদুন্নবী (দ.) (উর্দূ), ড. মুহাম্মদ তাহের উল কাদেরী, পৃ. ২৮৩; সুনানুল কুবরা, ইমাম বায়হাকী।

৯. মিলাদুন্নবী (দ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫,২৮৬।

১০. সহিহ্ মুসলিম, হাদিস নং ১১৬২; সুনানে আবু দাউদ; মাসনাদে আহমদ।

১১. মাসনদে আহমদ, হাদিস নং ১৬৭০০,১৬৭১২; বায়হাকী; তারিখিল কবির, ইমাম বুখারী; মুসতাদরাক আল হাকিম; তাবরানী।

১২. পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা.) সংকলন, শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী, ই.ফা.,পৃ.৩৬।

১৩. সহিহ্ বুখারী, হাদিস নং- ৪৭৩০, ই.ফা.।

১৪. মিলাদুন্নবী (দ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬,৩৩২,৩৩৮,৩৩৯।

লেখকঃ সদস্য, মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের তাৎপর্য

জাবেদ বিন আলম

১. পবিত্র কুরআনে মহানবী (দ.) সম্পর্কে উম্মতের প্রতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, "আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশ্‌তারা নবীর প্রতি 'সল্লু' পেশ করেন, হে বিশ্বাসীগণ তোমরাও নবীর প্রতি যথাযথভাবে সালাত ও তাসলিম পেশ কর" –(সূরা আহযাব:৫৬)। সূরা আহযাবের ৫৩ থেকে ৫৭নং আয়াতে মহানবী (দ.) এর অবস্থান, মর্যাদা এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন বিষয়ে বিশ্বাসীদেরকে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা আল ইমরানের ৮১-৮২নং আয়াতে মহানবী (দ.) সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীদের অঙ্গীকার গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ আছে। একই সঙ্গে পবিত্র কুরআনের অনেক সূরাতে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশনা সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে। এ গুলোর মধ্যে সূরা নিসা, সূরা আরাফ, সূরা সাবা, সূরা মুহাম্মদ এবং ঘটনা হিসেবে বায়াতুর রিজওয়ানের শপথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. পৃথিবীর প্রথম মানব এবং নবী হলেন হযরত আদম (আ.)। বেহেশ্‌তে আল্লাহ্‌র আরশের নিকটবর্তী অবস্থান থেকে পৃথিবীতে আগমনের পর বিচ্ছেদজনিত বিরহ-বেদনা হতে মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র নিকট হযরত আদম (আ.) ফরিয়াদ পেশের ওয়াসীলা হিসেবে 'মুহাম্মদ' নাম উল্লেখ করেন। এ পবিত্র নামের বরকতে আল্লাহ্ 'ওহী' প্রেরণের মাধ্যমে আদমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁকে 'নবী' ঘোষণা দেন। এ ছাড়া অনেক মশহুর পয়গম্বর মহানবী (দ.) এর উম্মত হবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন।

৩. মহানবী (দ.) হলেন পরম বরকতময় 'ইনসান-ই কামিল'। তাঁর পবিত্র বিলাদত (জন্ম) মক্কায়, মদীনায় হিযরত এবং বেসাল শরিফ একই দিন ও তারিখে ১২ই রবিউল আওয়াল, সোমবার সম্পন্ন হয়। তিনি 'হায়াতুন্নবী' হিসেবে সম্বোধিত। এখন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু পবিত্র কুরআন, হাদীস শরিফ, তাঁর প্রবর্ণিত পার্থিব জীবন ব্যবস্থা এবং সুমধুর আযান ও সালাতে তিনি সর্বাবস্থায় মানব হৃদয়ে সিংহাসন নিয়ে অবস্থানরত আছেন। এ কারণে তাঁকে আল্লাহ্ প্রদত্ত 'মর্যাদা' এবং সম্মান' এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে 'ঈদ' উদ্‌যাপন করা উম্মতের কর্তব্য এবং দায়িত্ব।

৪. মহানবী (দ.) এর সম্মানে মিলাদ-কিয়াম রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর সময়েও বিদ্যমান ছিল। আবদুল খাত্তাব ওমর কলভী (রহ.) এর 'কিতাবুল তানবীর ফি মৌলুদুল বসির ওয়াল নজির' এবং আল্লামা সুয়ূতির (রহ.) 'সুবিলীল হুদা ফি মৌলুদিল মোস্তফা' কিতাবে হযরত আবু দ্বারদা (রা.) এর একটি বর্ণনাতে দেখা যায়, হযরত আবু আমের (রা.) এর গৃহে মহানবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা কালে হুজুর (দ.) সেখানে উপস্থিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মহানবী (দ.) তখন উল্লেখ করেন, "ওহে আবু আমের, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের

জন্য রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন এবং সমস্ত ফেরেশ্‌তারা তোমাদের জন্য দোয়া করছেন। যারা তোমাদের মতো এ রূপ মিলাদ-মাহফিল করবে তারাও তোমাদের মতো পরিত্রাণ পাবে।" মিলাদ সম্পর্কিত বিষয়ে হযরত হাফেজ ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) 'মৌলুদুল কবির', আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওসমান (রহ.) 'দুররুল মোনাজেম' এবং আল্লামা সুয়ূতি তাঁর পূর্বোক্ত কিতাবে হযরত আব্বাস (রা.) এর গৃহে মিলাদ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে মহানবী (দ.) উল্লেখ করেন, "তোমাদের জন্য শাফায়াত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল।"

৫. মিলাদুন্নবী (দ.) এর সমর্থনে যারা ফতোয়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (রহ.), হযরত আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.), হযরত শামসুদ্দীন আল-জযয়ী (রহ.), হযরত ইমাম শামসুদ্দীন বিন নাছির উদ্দীন দামেস্কী (রহ.), হযরত কামাল উদ্দীন আল-আদফবী (রহ.), হযরত ইমাম যুরকানী (রহ.), হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.), হযরত মুহাদ্দিস ইবনে জুযী (রহ.), মসজিদে নববীর ইমাম হযরত শেখ আবু শামা (রহ.), হযরত ইমাম সাখাভী (রহ.), হযরত কুস্তলানী (রহ.), হযরত ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহ.), শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), ইমাম কুতুবুদ্দীন আল হানাফী (রহ.), হযরত এমদাদুল্লাহ্ মোহাজের মক্কী (রহ.) প্রমুখ। এছাড়া ইবনে তাইমিয়া, আবু যরআ ইরাকী, নাছিরুদ্দীন ইবনুত তবাখ, জালাল উদ্দীন কাত্তানী, জহির উদ্দীন জাফর আল মিশরী, শাহ আবদুর রহিম দেহলভী, মাওলানা আবদুল হাই লৌক্ষ্ণভী, মুহাম্মদ বিন জারাল্লাহ বিন যহিরা, শেখ মুহাম্মদ রেযা মিশরী, মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সহ অসংখ্য খ্যাতিমান চিন্তাবিদ মিলাদুন্নবী (দ.)-এর পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

৬. ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) মাত্র তেষট্টি বৎসর পৃথিবীতে অবস্থানকালে তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার এবং তদ্‌উদ্দেশ্যে মানব চরিত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে বিভিন্ন সময় যে ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন এ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করা। যেমন; আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে যেভাবে তিনি জুলুম, নির্যাতন এবং সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে প্রতিপক্ষের হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ আচার-ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েও পরম ধৈর্য, সহনশীলতা, সত্যবাদিতার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন তা বর্ণনা করা প্রয়োজন। বিশ্বনবী (দ.) শুধু রাষ্ট্রনেতা অভিপ্রায়ে যদি ধর্ম প্রচার করতেন তাহলে ধর্ম প্রচার ব্যতীতও আরবের বাদশাহ্ করার প্রস্তাব তাঁর প্রতিপক্ষরা তাঁকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এ ধরনের লোভনীয় ক্ষমতাদর্পের দাম্ভিক প্রস্তাব তিনি অসীম সাহসিকতায় প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছেন যে; তাঁর মহান লক্ষ্য অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা প্রভাব-প্রতিপত্তি নয়, বরং এক আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ভিত্তিতে মানব চরিত্রের পরিবর্তন সাধন এবং প্রয়োগিক সংশোধন সম্পন্ন করে

মানবকে “আশরাফুল মাখলুকাত” মর্যাদায় উন্নীত করা। এ জন্যে তিনি মানব চরিত্রে মহান রাব্বুল আলামীনের অতুলনীয় অসীম সৌন্দর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমূহের বিকাশ সাধনকল্পে নৈতিক বিপ্লব সাধনে সর্বোচ্চ কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এ ধরনের কর্মপন্থা এবং প্রচার কাজে যারা বার বার বাধা প্রদান করে শুভ আয়োজন ও দাওয়াতকে বিনাশ করতে সশস্ত্র কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে তিনি তাদের আক্রমণ এবং জীঘাংসা প্রতিহত ও প্রতিরোধকল্পে আল্লাহ্‌র নির্দেশে জিহাদের ডাক দিয়েছেন। একই সঙ্গে মানব চরিত্রের ব্যষ্টিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক গতি প্রবাহে যে সামষ্টিক পরির্তন সহজসাধ্য হয়ে যায় তার সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে মদীনা সনদের ভিত্তিতে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল প্রকার মানবগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকল্পে সাম্য, ন্যায় বিচার ও মানব মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মদীনা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে চরম প্রতিকূল অবস্থা তথা সশস্ত্র পন্থায় বাধাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষ পরিহার করে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য এবং সকল মানুষের প্রতি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে অগ্রবর্তী হওয়ার নজীর উপস্থাপন করা। এ ধরনের মিশন তিনি মদীনা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবীদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে এ ধরনের মিশনে অকুতোভয়ে এগিয়ে আসেন তাঁরই মহান আদর্শে মহীয়ান অসংখ্য অলি, দরবেশ, গাউস, কুতুব, ফকির, মস্ত, কলন্দর, ময্‌জুব চরিত্রের তাসাওউফ সাধকরা। পবিত্র মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনের জন্যে যেহেতু আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়তম রাসূলের (দ.) প্রতি পরম আনুগত্য এবং নিঃশর্ত ভালবাসার সীমাহীন উষ্ণতা উত্তাল তরঙ্গমালার মতো মুসলিম উম্মাহ্ সহ বিশ্ববাসীকে উদ্বেলিত করে তখন উপর্যুক্ত কর্মপন্থা সমূহের বয়ান সমাজ সংশোধন ও পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে ধারণা করা যায়।

৭. পৃথিবীতে বর্তমান সময়ে নানা ধরনের মতবাদ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন ঘিরে মানব সমাজে বহুধা বিভক্তি রয়েছে। এ সকল মতাদর্শগুলোর মধ্যে অনেক মতবাদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণকারী এবং কোন কোনটি নৈরাশ্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী এবং অনৈতিকতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। পৃথিবীর অনেক মানুষ এ সকল মতবাদের পূজারীও বটে। এদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডা বহুমুখি। অনেকগুলো মতাদর্শ অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ম্যাজিক্যাল আয়োজনে প্ররোচনাদায়কের ভূমিকাও পালন করে থাকে। এ ধরনের অপশক্তি এবং দানবীয় চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরাভূত করার জন্য প্রকাশ্যে বিশাল গণ জামায়েত এবং শোভাযাত্রা প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে। এ ধরনের সমাবেশ এবং শোভাযাত্রা (জুলুস) ঈদ উৎসবের খোশ মেজাজে যতো বেশি আয়োজন করা যায়, ততো বেশি আল্লাহ্ এবং রাসূল (দ.) বিদ্বেষী মতবাদ অনুসারী দানবরা ভীত এবং সংযত থাকবে। ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে শোভাযাত্রার জনস্রোত যতো দীর্ঘ এবং জনতার অংশগ্রহণমূলক হবে ততো বেশী ধর্ম, নৈতিকতা এবং তাওহীদ বিরোধীদের অপচিন্তা-অপকর্ম হ্রাস পেতে থাকবে। এছাড়া ইসলাম ধর্মের পুনঃজাগরণ লক্ষ্যে অস্ত্রবল নয় বরং প্রচণ্ড নৈতিক মানসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজন অত্যধিক। এ জনবলের দীপ্ত কণ্ঠে যখন ‘ইয়া নবী সালাম আলাইকা”

ধ্বনিত-প্রতিধ্বণিত হবে তখন মানব শত্রু শয়তান ও তার অনুগামীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপনে গণ-সম্পৃক্ততা যতো বেশি বাড়ানো যাবে ততো বেশি মহানবীর (দ.) মর্যাদার পতাকা ভূবনময় পরিদৃষ্ট হবে, বিশ্বময় চির মহান ও নন্দিত থাকবেন মহানবী (দ.) আমিন।

লেখক: লেখক ও গবেষক।

পবিত্র কুরআনের আয়নায় ঈদে মিলাদুন্নবী এবং রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর অনন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল

এক. 'রাব্বুল আলামীন' আল্লাহ্তায়ালা হলেন সকল সৃষ্টির রব, আর 'রহমাতুল্লিল আলামীন' রাসূল (দ.) হলেন সকল সৃষ্টির জন্য রহমত[১]। আর আল্লাহ্র রাসূল (দ.) নিজেও বলেছেন তিনি হলেন মানবমণ্ডলী তথা সমগ্রসৃষ্টির জন্য রহমত এবং হাদিয়াস্বরূপ (উপহার স্বরূপ)[২]। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, "(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্র 'অনুগ্রহ' ও তাঁরই 'রহমত' প্রাপ্তিতে তোমাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তোমাদের পুঞ্জীভূত ধনসম্পত্তির চেয়ে এ অনেক শ্রেয়"[৩]। আর রাসূল (দ.) হলেন মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে সেই 'রহমত', তাই তাঁর শুভাগমনের দিনটি সমগ্র কায়েনাতের নিকট খুশি ও আনন্দের দিন। এই দিনকে 'ঈদ' বলা হয়, কারণ পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'মারইয়াম তনয় ঈসা বললেন, হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! আকাশ থেকে আমাদের জন্য পাত্র ভরা খাবার প্রেরণ করুন। এ হবে আমাদের জন্য, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য 'ঈদ' তথা আনন্দ-উৎসব এবং আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত সত্যের নিদর্শন'[৪]। সুতরাং মহান আল্লাহ্ হতে 'রহমত' প্রাপ্তির দিনটি বান্দার জন্য ঈদ হয়। আর এই দিনে আনন্দ করা নবীদের (আ.) সুন্নাহ। তাই মহানবী (দ.) এর জন্মদিবস অর্থাৎ এই ধরায় তাঁর আগমনের দিনটিকে 'ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (দ.)' বলা হয়। আর কেউ যদি একে 'সিরাতুন্নবী (দ.)', 'উরসুন্নবী (দ.)' বা 'মিলাদ' বলে উদ্‌যাপন করে তাতেও কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ সবাই তো রাসূলে করিম (দ.) এর পবিত্র মিলাদ উপলক্ষেই এসব করছে।

দুই. মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব নূরে মুজাস্‌সাম (দ.)কে এমন অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি সৃষ্টির মধ্যে বে-মেসাল। আবার মহান আল্লাহ্ই তাঁর বৈশিষ্টগুলো পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং রাসূলে খোদা (দ.) এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা মহান আল্লাহ্র সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের আয়নায় প্রিয় নবী (দ.) এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এরূপ– ১. তাঁর আপাদমস্তক নূর। মহান আল্লাহ্ বলেন, "নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট একটি নূর এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে"[৫]। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে নূর দ্বারা রাসূলে আকরাম (দ.) উদ্দেশ্য[৬]। ২. তাঁর সৌন্দর্য ও রূপের উপমা দেওয়া হয়েছে উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে এবং তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে– "হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়ক রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে"[৭]। ৩. তাঁকে মহান আল্লাহ্ উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে তুলনা করেছেন। "উজ্জ্বল নক্ষত্রের শপথ! যখন তা অস্তমিত হয়"[৮]। এখানে 'নজম' বা উজ্জ্বল নক্ষত্র বলতে রাসূল (দ.) উদ্দেশ্য আর 'হাওয়া' বা অস্তমিত হয় দ্বারা মেরাজ হতে প্রত্যাগমণ উদ্দেশ্য[৯]। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "শপথ

আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। আপনি কি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র”[১০]। এখানেও ‘নজম’ দ্বারা রাসূল (দ.) এর পবিত্র সত্ত্বা উদ্দেশ্য[১১]। ৪. মহান আল্লাহ্ তাঁর জীবনের কসম করেছেন– “হে মাহবুব! আপনার জীবনের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল”[১২]। ইমাম কুরতুবী বলেন, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর জীবনের শপথ নেয়াটা হচ্ছে ইজ্জত-সম্মানের শীর্ষ ও চূড়ান্ত স্থান[১৩]। ৫. তাঁর সম্পর্কযুক্ত সব কিছুই মহান আল্লাহ্‌র নিকট কসমের উপযোগী– “আমি শপথ করছি এই নগরীর। আর আপনি এই নগরীর অধিবাসী। শপথ জনক ও জাতকের”[১৪]। এখানে নগরী বলতে পবিত্র মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। আর তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে রাসূলে করিম (দ.) এই শহরে আগমন করেছেন। আর তৃতীয় আয়াতে ‘ওয়ালিদ’ বা জনক দ্বারা হযরত আদম ও হযরত ইব্রাহীম (আ.) অথবা প্রত্যেক পিতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এক বর্ণনায়, ‘মা ওয়ালাদ’ দ্বারা মহানবী (দ.)কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে (সূত্রঃ তাফসিরে মাযহারী)। অন্য আয়াতে এসেছে, “এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা) শপথ”[১৫]। ৬. রাসূলুল্লাহ্ (দ.)কে মহান আল্লাহ্ নাম ধরে সম্বোধন করেন নি। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “হে রাসূল! যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন”[১৬] এমনি ভাবে সূরা মায়েদা, আয়াত নং– ৪১, সূরা আনফালের ৬৪ আয়াতেও– ‘হে রাসূল’, ‘হে নবী’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ অন্য নবীদের (আ.) নাম ধরে সম্বোধন করেছেন, যেমন– “হে নূহ্! অবতরণ কর আমাদের নিরাপত্তাধীনে”[১৭], এমনিভাবে সূরা বাক্বারার ৩৫নং আয়াতে ‘হে আদম!’, সূরা কাসাসের ৩০নং আয়াতে “হে মূসা!’, সূরা সাফ্‌ফাত এর ১০৪নং আয়াতে ‘হে ইব্রাহীম!’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ৭. ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিভিন্ন উপাধি দিয়েও মহান আল্লাহ্ তাঁকে সম্বোধন করেছেন, “হে বস্ত্রাবৃত!”[১৮], “হে চাদরাবৃত!”[১৯], “তোয়া-হা”[২০], “ইয়া-সিন”[২১]। ৮. আর সর্বসাধারণকেও তাঁকে সাবধানে সম্বোধন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, “তোমরা রাসূল (দ.)কে আহ্বানের ক্ষেত্রে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের পদ্ধতি অবলম্বন করো না”[২২]। ৯. তাঁর বিভিন্ন অঙ্গের শপথ করেছেন, “শপথ পূর্বাহ্নের [অর্থাৎ মহানবী (দ.) উর্ধ্বলোকে উঠার] শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়। আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি”[২৩]। এখানে উপমার মাধ্যমে পূর্বাহ্নের মত আলোকোজ্জ্বল মুখমণ্ডলকে ‘ওয়াদ্ দোহা’ এবং অন্ধকার রাত্রির মত তাঁর যুলফি ও চুলের গোছাকে “ওয়াল্ লাইল” উল্লেখ করা হয়েছে[২৪]। অন্য আয়াতে তাঁর দৃষ্টির বর্ণনায় এসেছে, “তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘন করেননি”[২৫]। তাঁর আত্মার আলোচনায় বলা হয়েছে, “রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলে নি যা তিনি দেখেছেন”[২৬]। ১০. তাঁর প্রতি পবিত্র কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তঃকরণকে মজবুত করার জন্য”[২৭]। ১১. সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন রিসালাতের ধারক বাহক হলেন রাসূলে করিম (দ.)। এই মর্মে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– ‘হে রাসূল! আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি’[২৮]। ১২. তাঁর অন্তরের প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততার প্রাচুর্য

দান করেছেন– "আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, যা আপনার পিঠকে অতিশয় ভারি করে দিয়েছে"[২৯]। ১৩. তাঁর আলোচনাকে সব সময়ের জন্য সমুচ্চ করা হয়েছে– "(হে হাবীব!) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি"[৩০]। ১৪. তাঁর পছন্দনীয় বিষয় মহান আল্লাহ্‌র কাছেও পছন্দনীয়– "আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন। অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন"[৩১]। অন্য আয়াতে এভাবে এসেছে, "অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিব যাকে আপনি পছন্দ করেন, এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান"[৩২]। ১৫. তাঁর সমস্ত কথাই মহান আল্লাহ্‌র ওহী– "তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"[৩৩]। ১৬. তাঁর কর্মকাণ্ড বস্তুত মহান আল্লাহ্‌রই কর্ম– "যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়, তারা তো আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে"[৩৪], "আর (হে হাবীব!) আপনি মাটির মুষ্টি (শত্রুর প্রতি) নিক্ষেপ করেন নি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্"[৩৫]। ১৭. তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণ– "যে ব্যক্তি এই রাসূল (দ.) এর অনুসরণ করলো সে তো আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করলো"[৩৬], "হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুসরণ কর, আর যদি তোমরা ঘাড় ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা কাফিরদেরকে ভালবাসেন না"[৩৭]। ১৮. মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর প্রতি রহমত বর্ষন করেন এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগণও সর্বদা রাসুলুল্লাহ্‌র (দ.) জন্য দোয়া করেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নবীর [মহানবী (দ.)] উপর অবিরাম রহমত বর্ষণ করছেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুয়া করে চলেছেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর যথাযথভাবে দরূদ ও সালাম পাঠ কর"[৩৮]।

তিন. বর্ণিত আয়াতগুলো ছাড়াও পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবী (দ.) এর শান-মান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য আয়াত। এ বিষয়ের উপর অনেক বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ আলেম স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় মহানবী (দ.) এর মর্যাদা-গুণাবলী এবং তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা মহান আল্লাহ্‌র সুন্নাহ্। তাই মুসলিম জাহানে আজো অত্যন্ত পূণ্যময় কাজ হিসেবে প্রিয় নবীর (দ.) সিরাত-শামায়েল এর আলোচনা অনুষ্ঠান এবং তাঁর পবিত্র বিলাদত শরিফ উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এর আয়োজন করা হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানেও ফুটে উঠে প্রিয় নবীর (দ.) মিলাদ শরিফের বর্ণনা এভাবে– "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।/ মধু-পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে।/ যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে ॥/ কুল মখ্‌লুকে আজি ধ্বনি ওঠে "কে এল ঐ"/ কলেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে "কে এল ঐ"/ খোদার জ্যোতিঃ পেশানীতে ফোটে "কে এল ঐ"/ আকাশ-গ্রহ-তারা পড়ে লুটে "কে এল ঐ"/ পড়ে দরুদ্ ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌তে সব দুয়ার খোলে ॥"[৩৯]

তথ্যসূত্র:

১. আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ১০৭।

২. আল মুসতাদরাক, ইমাম হাকিম, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫।
৩. আল কুরআন, সূরা ইউনুস : ৫৮।
৪. আল কুরআন, সূরা মায়েদা : ১১৪।
৫. আল কুরআন, সূরা মায়িদা : ১৫।
৬. তাফসির ইবনে আব্বাস, খণ্ড ১, পৃ. ৩০৪, ই.ফা.।
৭. আল কুরআন, সূরা আহযাব : ৪৫,৪৬।
৮. আল কুরআন, সূরা আন নজম : ১।
৯. কুরআন অউর শামায়েলে নববী (দ.), ড. মুহাম্মদ তাহের উল কাদেরী (উর্দূ)।
১০. আল কুরআন, সূরা আত তারিক : ১,২,৩।
১১. কুরআন অউর শামায়েলে নববী (দ.), প্রাগুক্ত।
১২. আল কুরআন, সূরা হিযর. ৭২।
১৩. কুরআন অউর শামায়েলে নববী (দ.), প্রাগুক্ত।
১৪. আল কুরআন, সূরা বালাদ : ১,২,৩।
১৫. আল কুরআন, সূরা ত্বীন : ৩।
১৬. আল কুরআন, সূরা মায়েদা : ৬৭।
১৭. আল কুরআন, সূরা হুদ : ৪৮।
১৮. আল কুরআন, সূরা মুজ্জাম্মিল : ১।
১৯. আল কুরআন, সূরা মুদদ্দাসির : ১।
২০. আল কুরআন, সূরা তোয়া-হা : ১।
২১. আল কুরআন, সূরা ইয়াছিন : ১।
২২. আল কুরআন, সূরা আন নূর : ৬৩।
২৩. আল কুরআন, সূরা দোহা : ১,২,৩।
২৪. কুরআন অউর শামায়েলে নববী (দ.), প্রাগুক্ত।
২৫. আল কুরআন, সূরা নাযম : ১৭।
২৬. আল কুরআন, সূরা ফুরকান : ৩২।
২৭. আল কুরআন, সূরা ফুরকান : ৩২।
২৮. আল কুরআন, সূরা সাবা : ২৮।
২৯. আল কুরআন, সূরা ইনশিরাহ্ : ১,২,৩।
৩০. আল কুরআন, সূরা ইনশিরাহ্ : ৪।
৩১. আল কুরআন, সূরা দোহা : ৫।
৩২. আল কুরআন, সূরা বাক্বারা : ১৪৪।
৩৩. আল কুরআন, সূরা নযম : ৩,৪।
৩৪. আল কুরআন, সূরা ফাতাহ্ : ১০।
৩৫. আল কুরআন, সূরা আনফাল : ১৭।
৩৬. আল কুরআন, সূরা নিসা : ৮০।
৩৭. আল কুরআন, সূরা আল ইমরান : ৩২।
৩৮. আল কুরআন, সূরা আহজাব : ৫৬।
৩৯. নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, সম্পাদনা: আবদুল মুকীত চৌধুরী, ৫ম স: মে ২০০৯, ই.ফা., পৃ. ১৩০।

লেখক: সদস্য, মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।

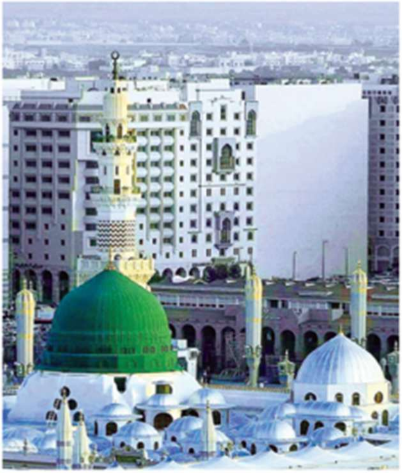

পবিত্র মদিনা শরিফ

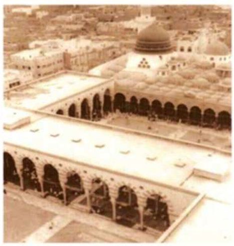

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দিতে তোলা
পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারা'র ছবি

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দিতে তোলা
পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারা'র ছবি

১৯২৬ সাল (ঘড়ির কাঁটানুসারে): লিবিয়ার ত্রিপোলীতে (পরপর তিনটি ছবি) নিচে বামে: ১৯২০ সালে জেরুযালেমে।

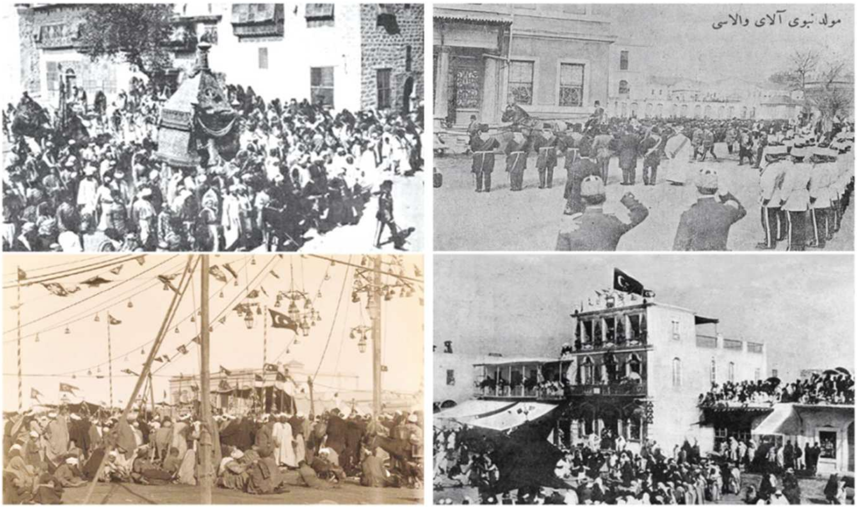

ঘড়ির কাঁটানুসারে: আঠারো শতকের শেষদিকে তৎকালীন সরকারের ব্যবস্থাপনায় পবিত্র মক্কার ঐতিহাসিক 'জুকাক আল মওলিদ'-এ। ১৯১৫ সালে ইস্তাম্বুলে তৎকালীন সুলতান মেহমেদ ভি'র তত্ত্বাবধানে। ১৮৯৬ সালে ওসমানীয় খিলাফতের সময় লিবিয়ার বেনগাজি শহরে রাষ্ট্রীয়ভাবে পতাকা উত্তোলন হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে কায়রোতে।

বামে (উপরে ও নিচে): পাকিস্তানের করাচিতে রাতে বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা এবং লাহোরে শোভাযাত্রা। ডানে (উপরে ও নিচে): ভারতের হায়দ্রাবাদের 'মক্কা মসজিদ'এ জুমা নামায আদায় এবং রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

ঘড়ির কাঁটানুসারে): মিশরের কায়রোতে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বি.)-এর মাযারের সম্মুখে প্যালেস্টাইনের

ইরাক (ঘড়ির কাঁটানুসারে): রাজধানী বাগদাদে ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহ.)'র মাযারের সামনে ** আরবিল শহরে *** বাকুবাহ শহরে জুলুসের প্রস্তুতি *** কুর্দিস্তানে উদযাপন শেষে তাবার্‌রুক বণ্টনের প্রস্তুতি

ঘড়ির কাঁটানুসারেঃ রাশিয়ার দাগেস্তান প্রদেশের রাজধানী মাখচালায় * ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় * ভারতের কাশ্মীরের শ্রীনগরে হযরত বাল মাযার সম্মুখে সমবেত নারী-পুরুষ * বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার রাজধানী সারায়েভো'র গাজী হুসরেভ মসজিদে একটি অনুষ্ঠান

ঘড়ির কাঁটানুসারেঃ ইয়েমেনের রাজধানী সান'আয় আল-সালিহ্ মসজিদের সম্মুখে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাবেশ উদযাপন (উপরে বামে ও ডানে) * কেনিয়ার বন্দর নগরী লামুতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা * তুরস্কের দিয়েরবাকির শহরে মহিলাদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

ভারত: আজমির শরিফে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ শায়খ সৈয়দ মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী হাসান সন্‌জরী (রহ.)'র মাযারে
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাজ-সজ্জা।

ইরাক: বাগদাদ শরিফে হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)'র মাযারে
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাজ-সজ্জা।

মরক্কো: রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং সামা'র আসর

মিশর (ঘড়ির কাঁটানুসারে): কায়রোতে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বি.)-এর মাযার সংলগ্ন মসজিদে * রাজপথে শোভাযাত্রা * হযরত সৈয়দা জয়নব (রহ.) মসজিদের সম্মুখে এবং হুমায়থারায় শাজালীয়া ত্বরিকার ইমাম শায়খ সৈয়দ আবুল হাসান শাজালী (রহ.)'র মাযারের সম্মুখে

প্যালেস্টাইন: রাজধানী জেরুযালেমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণ

ঘড়ির কাঁটানুসারে: দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অ্যাথলন স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য সমাবেশ * লেবাননের রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা * মায়ানমারের রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা * ইন্দোনেশিয়ায় বর্ণাঢ্য জনসমাবেশ

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা), বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২, বাংলাদেশ।
ই-মেইলঃ macademy2002@gmail.com